বুড়ো-বুড়ির মুখিকচু

মণিপুরি ফুঙ্গাওয়ারি বা লোককাহিনি

এ কে শেরাম

CamScanner

অন্য জনগোষ্ঠীর মতো মণিপুরি লোকসমাজেও প্রচলিত আছে অনেক লোককাহিনি। সাধারণত রাতে কাজের অবসরে বাড়ির কোনো প্রবীণ বিশেষত মা, দাদা বা দাদিকে ঘিরে বসে শিশুরা এইসব কাহিনি শোনে। মণিপুরিদের গৃহাভ্যন্তরে একটি অগ্নিকুণ্ড থাকে, যা সবসময় প্রজ্জ্বলিত থাকে। মণিপুরিরা একে 'ফুঙ্গা' বলে। রাতে, বিশেষ করে শীতের রাতে, এই 'ফুঙ্গা'কে ঘিরে বসে শিশুরা এইসব কাহিনি বা 'ওয়ারি' শুনে বলে মণিপুরি ভাষায় এর নাম 'ফুঙ্গাওয়ারি'। এই সব লোককথায় যেমন প্রতিফলিত হয় মণিপুরি সমাজজীবনের বিভিন্ন বিষয়, তেমনই এইসব কাহিনিতে বিধৃত থাকে সমাজের নানা অন্যায় এবং অসংগতির চিত্রও। শিশুতোষ বিষয় নিয়েই অধিকাংশ কাহিনি রচিত। বিভিন্ন পশু-পাখি, দৈত্য-দানো যেমন এইসব কাহিনির প্রধান বিষয়, তেমনই মণিপুরি লোকজীবনের নানা চিত্রও আমরা কাহিনিগুলোতে পাই। এরকম কিছু 'ফুঙ্গাওয়ারি' বা মণিপুরি লোককাহিনি নিয়েই এ গ্রন্থ *বুড়ো-বুড়ির মুখিকচু*, যা শুধু শিশু বা কিশোর মনকেই নয়, বয়স্কদেরকেও আন্দোলিত করবে নিঃসন্দেহে।

প্রচ্ছদ : তৌহিন হাসান
আলোকচিত্র : প্রণবেশ দাশ

CamScanner

বুড়ো-বুড়ির মুখিকচু

CamScanner

বুড়ো-বুড়ির মুখিকচু

মণিপুরি ফুঙ্গাওয়ারি বা লোককাহিনি

এ কে শেরাম

নাগরী

CamScanner

বুড়ো-বুড়ির মুখিকচু
এ কে শেরাম

স্বত্ব : লেখক

প্র কা শ ক
নাগরী
বারুতখানা, সিলেট-৩১০০, বাংলাদেশ

প্র থ ম প্র কা শ
অমর একুশে বইমেলা ২০১৫
প্রচ্ছদ : তৌহিন হাসান
অলংকরণ : এন যোগেশ্বর অপু
মূল্য : ১৩০ টাকা

Buro-Burir Mukhi Kochu By A K Sheram
Published by NAGREE, Sylhet-3100, Bangladesh,
01714 610061, 01712 082967, nagree14@gmail.com
Price : Tk 130 only
ISBN 978-984-91241-1-2

CamScanner

থাম্বাল দেবী

আমার মা-কে,
খুব ছোটবেলায় যাঁকে হারিয়েছি,
যাঁর মুখে শোনা অনেক 'ফুঙ্গাওয়ারি' বা লোককাহিনি
এখনও আমার প্রিয় স্মৃতিসুধা হয়ে আছে।

CamScanner

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

১. বসন্ত কুন্নিপালগী লৈরাং —১৯৮২ (মণিপুরি কাব্য); ২য় সংস্করণ ২০১১
২. কংলৈ ঈয়েক ঈপী—১৯৮৪ (মণিপুরি লিপি শিক্ষার বই)
৩. চৈতন্যে অধিবাস—১৯৮৮ (বাংলা কাব্য)
৪. বাংলাদেশের মণিপুরি কবিতা (অনুবাদ ও সম্পাদনা)—১৯৯০: ২য় সংস্করণ ২০১১ (বাংলা অনুবাদসহ নির্বাচিত মণিপুরি কবিতা)
৫. মণিদীপ্ত মণিপুরি ও বিষ্ণুপ্রিয়া বিতর্ক : ইতিহাসের দর্পণে দেখা—১৯৯৩ (গবেষণাধর্মী বাংলা গ্রন্থ)
৬. বাংলাদেশের মণিপুরি : ত্রয়ী সংস্কৃতির ত্রিবেণী সঙ্গমে—১৯৯৬ (মণিপুরি বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন)
৭. মণিপুরি শক্তাক খুদম (সম্পাদিত)—১৯৯৯ (মণিপুরি প্রবন্ধের সংকলন)
৮. নোঙ্গৌবী—২০০১ (মণিপুরি ছোটোগল্প)
৯. মঙলানগী অতিয়াদা নুমিৎ থোকপা—২০০৭ (মণিপুরি কাব্য)
১০. মণিপুরি নাচোম (সম্পাদিত)—২০০৮ (৪র্থ সংস্করণ ২০১২)
১১. প্রেমে-অপ্রেমে আছি, আছি দ্রোহী চেতনায়—২০১০ (বাংলা কাব্য)
১২. অতোপ্পা লৈরাং—২০১০ (মণিপুরি প্রবন্ধ সংকলন)
১৩. এস ভানুমতি দেবীর নির্বাচিত কবিতা (অনুবাদ ও সম্পাদনা)—২০১১ (মণিপুরি কবিতার বাংলা অনুবাদ)
১৪. মৈরা পাইবী—২০১১ (বাংলা ভাষায় রচিত মণিপুর ও মণিপুরি বিষয়ক ভ্রমণ-উপন্যাস)
১৫. অন্যস্বর : নির্বাচিত মণিপুরি কবিতা (অনুবাদ ও সম্পাদনা)—২০১১ (মণিপুরি কবিতার সংকলন)
১৬. মণিপুরি (মৈতৈ) ময়েক মপী—২০১২ (মণিপুরি লিপি শিক্ষার বই)
১৭. লম্মাঙনবা—২০১২ (মণিপুরি উপন্যাস)
১৮. পথভ্রষ্ট পথিক—২০১৩ (উপন্যাস, লম্মাঙনবা'র বাংলা অনুবাদ)
১৯. শুধু তোমারই জন্য—২০১৪ (বাংলা কবিতা)
২০. মণিপুরি ভাষা—২০১৪ (মণিপুরি ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ)

CamScanner

প্রসঙ্গ-কথা

মণিপুরি সমাজে অনেক লোককথা ও কাহিনি প্রচলিত আছে। এগুলোর মধ্য দিয়ে মণিপুরি সমাজজীবনের বিভিন্ন বিষয় যেমন প্রতিফলিত হয়, তেমনই এসব কথা ও কাহিনিতে বিধৃত থাকে সমাজের নানা অন্যায় এবং অসংগতির চিত্রও। শিশুতোষ বিষয় নিয়ে অধিকাংশ কাহিনি রচিত। বিভিন্ন পশুপাখি, দৈত্যদানো যেমন এসব কাহিনির প্রধান বিষয়, তেমনই মণিপুরি লোকজীবনের নানা চিত্রও আমরা কাহিনিগুলোতে পাই। লোকপরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসা এসব কাহিনির কোনো রচয়িতার সন্ধান কেউ জানে না। সাধারণত রাতে কাজের অবসরে বাড়ির কোনো প্রবীণ বিশেষত মা, দাদা বা দাদিকে ঘিরে বসে শিশুরা এসব কাহিনি শোনে। মণিপুরিদের গৃহাভ্যন্তরে একটি অগ্নিকুণ্ড থাকে, যা সবসময় প্রজ্জ্বলিত। মণিপুরিরা একে 'ফুঙ্গা' বলে। রাতে বিশেষ করে শীতের রাতে এই ফুঙ্গাকে ঘিরে বসে শিশুরা এসব কাহিনি বা 'ওয়ারি' শুনে বলে মণিপুরি ভাষায় এর নাম 'ফুঙ্গাওয়ারি'। এরকম কিছু ফুঙ্গাওয়ারি বা লোককথা ও কাহিনি দিয়ে সাজানো

হয়েছে এ-গ্রন্থের কলেবর।

গ্রন্থটির একটি শোভন প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন শিল্পী তৌহিন হাসান এবং গ্রন্থের অভ্যন্তরভাগের অঙ্গসজ্জার কাজটি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পন্ন করে দিয়েছেন এন যোগেশ্বর অপু। সিলেটের নাগরী প্রকাশ সুন্দর ও নির্ভুলভাবে এ-গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে আন্তরিক প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের প্রতি রইলো আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

এ কে শেরাম

সিলেট
১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

CamScanner

সূ চি প ত্র

একটি পেবেৎ-এর গল্প। ১১
বুড়ো-বুড়ির মুখিকচু। ১৩
তপ্তা-এর কাহিনি। ১৮
কেইবু কেইওইবা। ২০
খাম্রেনচাক। ২৪
শন্দ্রেম্বী ও চাইশ্রা। ২৭
লাই খূৎশাংবী। ৩৩
পি-থাদোই। ৩৬
ইতা থাওমৈ। ৪২
বানরের পিঠাভাগ। ৪৪
ঘুঘুর ভূরিভোজ। ৪৭
য়েন্নখা পাউদাবি। ৫২

CamScanner

একটি পেবেৎ-এর গল্প

(পেবেৎ: একটি কল্পিত পাখি)

অনেকদিন আগের কথা। একটি পেবেৎ তার বাচ্চা-কাচ্চাদের নিয়ে জঙ্গলে একটি ছোট্ট গাছের ডালে বাসা বেঁধে থাকতো। ওই জঙ্গলে ছিল এক বনবিড়াল। পেবেৎ-এর নাদুসনুদুস ছানাগুলোকে দেখে বনবিড়ালের জিভে পানি আসে। সে শুধু সুযোগ খোঁজে কখন-কীভাবে পেবেৎ-ছানাগুলোকে খাওয়া যায়।

একদিন বনবিড়াল গাছের গোড়ায় এসে পেবেৎকে ডাক দেয়, 'পেবেৎ, পেবেৎ'।

পেবেৎ জবাব দেয়, 'আজ্ঞে মহাশয়'।

বনবিড়াল বলে, 'আমার চেহারাটা দেখতে কেমন?'

পেবেৎ শঙ্কিত হয়। সে মিথ্যে করে বলে, 'আজ্ঞে, জল ভর্তি কলস, ধান ভর্তি ভাঁড়ার আর শুঁটকি মাছের সম্পূর্ণ একটি মালার মতো সুন্দর।'

বনবিড়াল খুশি হয়। পেবেৎ-ছানা খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে সে আনন্দে নাচতে নাচতে ফিরে যায়। মা পেবেৎ-এর শঙ্কা বাড়ে। বনবিড়াল যখন তার বাচ্চাদের ঠিকানা জেনে গেছে তখন তারা আর নিরাপদ নয়। তাই সে সন্তানদের বাঁচানোর নানা উপায় নিয়ে ভাবে। প্রতিদিন বাচ্চাদেরকে উড়তে শেখায়।

কিছুদিন পর বনবিড়াল আবার আসে। একই প্রশ্ন করে পেবেৎকে। পেবেৎও নানা মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে, মিথ্যে প্রশংসা করে বিদায় করে তাকে। এভাবে দিন

CamScanner

যায়। পেবেৎ-ছানারা একটু একটু করে উড়তে শেখে। মা পেবেৎ তখন তার সন্তানদের বলে, 'দেখো বাছারা, তোমরা তো এখন উড়তে শিখেছো। এখানে আর বেশিদিন থাকা যাবে না। এবার বনবিড়াল এলে আমি আর মিথ্যে কথায় তাকে ভোলাবার চেষ্টা করবো না। অবস্থা খারাপ দেখলে আমি বলবো, 'বাছারা ফুড়ুৎ, তখনই তোমরা উড়াল দেবে।'

বনবিড়াল কিছুদিন পর আবার আসে। এসেই হাঁক দেয়, 'পেবেৎ'।

পেবেৎও খুব তমিজের সঙ্গে জবাব দেয়, 'আজ্ঞে মহাশয়।'

বনবিড়াল জিজ্ঞেস করে, 'পেবেৎ, আমার চেহারাটা দেখতে কেমন?'

এবার আর পেবেৎ মিথ্যে তোষামোদ করে না, বলে, 'কেমন আর কি, বনবিড়ালের চেহারাতো দেখতে বনবিড়ালের মতোই হবে।'

পেবেৎ-এর জবাব শুনে রাগে ফেটে পড়ে বনবিড়াল। সে লাফ দিয়ে গাছে ওঠে এবং পেবেৎ-ছানাগুলো ধরে খেতে চেষ্টা করে। অবস্থা বেগতিক দেখে মা পেবেৎ বলে 'বাছারা ফুড়ুৎ'। আর পেবেৎ ছানাগুলোও সঙ্গে সঙ্গেই উড়াল দেয়। কিন্তু সবচেয়ে ছোট ছানাটি তাড়াহুড়োর মধ্যে উড়াল দিতে দেরি করে। এর মধ্যে বনবিড়াল এসে ধরে ফেলে তাকে। পেবেৎ-ছানাটিকে হাতের মুঠোয় নিয়ে বনবিড়াল তাকে খেতে উদ্যত হতেই গাছের মগডালে বসে মা পেবেৎ বলে ওঠে, 'হেই বোকা বেড়াল, এভাবে কেউ খায় নাকি? এতে তো কোনো স্বাদই পাবে না।'

বনবিড়াল উপর দিকে তাকিয়ে বলে, তাহলে কীভাবে খাবো?

'শোনো', মা পেবেৎ বলে, 'আগে বাচ্চাটাকে ভালো করে পানিতে গোসল করিয়ে শরীরের সব ময়লা পরিষ্কার করে হাতের তালুতে বসিয়ে রোদে শুকাও, তারপর কয়েকবার উপরদিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারো যাতে শরীরে লেগে থাকা সব পানি ঝরে যায়, তারপর খেয়ো। তবেই তো আসল স্বাদ পাবে।'

বিড়াল ভাবে, ঠিকই তো। তাই সে পেবেৎ-ছানাটিকে ভালো করে পানিতে গোসল দিয়ে পরিষ্কার করে। তারপর হাতের তালুতে রেখে রোদে শুকোতে দেয়। এরপর তাকে উপরের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে। পেবেৎ-ছানাটি ঘন ঘন ডানা ঝাপটিয়ে পানি ঝেড়ে ফেলে। হঠাৎ গাছের মগডাল থেকে মা পেবেৎ বলে 'বাছা ফুড়ুৎ'। অমনি পেবেৎ-ছানাটি বনবিড়ালের হাতের তালুতে পিট করে মলত্যাগ করে উড়ে যায়। নিজের বোকামিতে ক্রুদ্ধ বনবিড়াল হাতের তালুতে থাকা পেবেৎ-ছানার বিষ্ঠাটিই কুৎ করে খেয়ে ফেলে। আহ কী মজা! বিষ্ঠাই যদি এতো মজা হয়, তবে শরীরটা না জানি কতো মজা হতো!

এই ভেবে বোকা বনবিড়াল কেবল আফসোস করতে থাকে।

CamScanner

বুড়ো-বুড়ির মুখিকচু

অনেক অনেক দিন আগে এক বুড়ো আর বুড়ি বাস করতো এক গ্রামে। তাদের বাড়িটি ছিল গ্রামের এক প্রান্তে, বনের ধারে। তাদের কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। বনে বাস করতো অনেক বানর। বুড়ো-বুড়ি তাদেরকে ছেলেমেয়ে বা নাতি-নাতনির মতো আদর করতো। বানরগুলোও বুড়ো-বুড়িকে খুব ভালোবাসতো এবং সবসময় এসে এটা-সেটা আবদার করতো। একদিন বুড়ো আর বুড়ি তাদের বাড়ির পাশের খেতে মুখিকচু লাগাবে বলে মাটি খুঁড়ে ভালো ভালো মুখির ছরাগুলো বেছে বেছে প্রস্তুত করতে থাকে। বনের ভেতর থেকে একদল বানর এসে চুপচাপ বসে দেখে বুড়ো-বুড়ি কী করছে। তাদের মধ্য থেকে সর্দার গোছের একজন গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, 'ইপু-ইবেন (দাদু-দাদি), কী করছ তোমরা?'

'কী আর করবো ইশু (নাতি), তোমার ইবেন (দাদি) আর আমি মিলে কয়েকটা মুখিকচুর ছরা লাগাবার চেষ্টা করছি।' বুড়ো কাজ করতে করতেই জবাব দেয়।

'কিন্তু ইপু (দাদু), মুখিকচু কী এভাবে লাগায়? তোমরা আসলে কিছুই জান না।'

বানরের কথা শুনে একটু ভড়কে যায় বুড়ো। 'তাহলে কীভাবে লাগাবো?'

'ইপু, প্রথমে মুখির ছরাগুলো ভালো করে ধুয়ে পানিতে সেদ্ধ করো। সেদ্ধ হয়ে গেলে পরিষ্কার কলাপাতা দিয়ে মুড়ে ভালো করে বেঁধে লাইন করে মাটির নিচে পুঁতে দিয়ো। দেখবে, কাল সকালেই মুখিকচুর বড় বড় গাছ হয়ে গেছে।' সর্দার

CamScanner

বানরটি খুব গুরুত্ব দিয়ে কথাগুলো বলে।

বানরের বলার ধরন দেখে বিশ্বাস হয় বুড়োর। বলে, 'ঠিক আছে ইশু, আমরা তাই করছি'। বুড়ো-বুড়ি মিলে প্রথমে মুখির ছরাগুলো ধুয়ে পরিস্কার করে, তারপর ভালো করে সেদ্ধ করে। সেদ্ধ হয়ে গেলে বানরের কথা অনুযায়ী পরিষ্কার কলাপাতা দিয়ে মুড়ে ভালো করে বেঁধে লাইন করে মাটির নিচে পুঁতে দেয়। বানরবাহিনী বসে বসে মন দিয়ে দেখে বুড়ো-বুড়ির কাজ। এগুলো শেষ করতে করতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে যায়। ক্লান্ত বুড়ো-বুড়ি হাতমুখ ধুয়ে ঘরের ভেতরে যায়। বানরদলও দাদু-দাদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বলে, 'ইপু-ইবেন, চিন্তা করো না; খেয়েদেয়ে শান্তিতে ঘুমাও। কাল সকালে উঠে দেখো, মুখিকচুগুলো কেমন বড় হয়ে গেছে।'

বুড়ো-বুড়ি খাওয়াদাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ে। রাতে বানরগুলো দল বেঁধে এসে বুড়ো-বুড়ির লাগানো মুখিকচুর সেদ্ধ ছরাগুলো মাটির নিচ থেকে তুলে এনে খুব আরাম করে খায়। তারপর পাশের জঙ্গল থেকে জংলি কচুর গাছগুলো শেকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে এসে খুব সুন্দর করে লাগিয়ে রাখে। ভোরে বুড়ির ঘুম ভেঙে যায় আগে। আসলে গতকালকের ঘটনায় বিশেষ করে বানর-নাতিদের কথা ভাবতে ভাবতে ঠিকমত ঘুমও হয়নি তার। দরজা খুলে ঘর থেকে বের হতেই দেখে কাল খেতে যেখানে মুখিকচুর ছরা লাগিয়েছে সেখানে বিশাল বিশাল কচুগাছ লকলক করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে তো বুড়ির চক্ষু ছানাবড়া। বুড়ি দৌড়ে গিয়ে বুড়োকে ডেকে তুললো ঘুম থেকে, 'এ্যাই হনুবা (বুড়ো), ওঠো, ওঠো। দেখো, বানর-নাতিদের কথা ঠিক ফলে গেছে। ইয়া বড় বড় কচুগাছে ভরে গেছে আমাদের খেত। এসো, তাড়াতাড়ি এসো, দেখে যাও কী তেলেসমাতি কাণ্ড।' বুড়ির চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ধড়মড়িয়ে ওঠে বুড়ো, 'দেখি দেখি, কী হয়েছে দেখি', বলতে বলতে বুড়ো বাইরে বেরিয়েই যা দেখে তাতে তার চোখও উঠে যায় কপালে। 'তাই তো, এতো অবাক কাণ্ড!' বুড়ো-বুড়ি দু'জনে ঘুরে ঘুরে দেখে তাদের কচুখেত।

বুড়ো খুব খুশি হয় বানর-নাতিদের বুদ্ধিমত্তা দেখে। বুড়িকে ডেকে বলে, 'হনুবি (বুড়ি), দেখো কচুগাছগুলো কেমন লকলক করে বেড়ে উঠছে। আজ দুপুরে তুমি সুন্দর দেখে এর কয়েকটি ডাঁটা কেটে তরকারি রান্না করো। আজ খুব মজা করে খাবো কচুশাক।'

বুড়িও খুশি খুশি গলায় বলে, 'ঠিক আছে, তা-ই হবে'। বুড়ি বেছে বেছে সুন্দর দেখে কচুগাছের কয়েকটি ডাঁটা কেটে নিয়ে আসে। দুপুরে খুব মন দিয়ে রান্না করে কচুশাক। বুড়ো টুকটাক কিছু কাজ সেরে নিয়ে স্নান আহ্নিক শেষ করে খেতে বসে। বুড়ি খুব আয়েশ করে ভাত বেড়ে দিয়ে পুরো এক বাটি কচুশাক তরকারি

এগিয়ে দেয় বুড়োর দিকে-'হনুবা, খাও, খাও; তুমি তো কচুশাক তরকারি খুব পছন্দ করো। পুরো এক বাটি ভর্তি করে দিলাম। লাগলে আরও দেবো।'

বুড়ো খুশি মনে খাওয়া শুরু করে। কচুশাকের তরকারি মেখে গপাগপ কয়েক গ্রাস ভাত গিলে নেয়। বুড়োর খাওয়া দেখে খুশি হয়ে বুড়ি জিজ্ঞেস করে, 'হনুবা, কেমন হলো কচুশাকের তরকারি?' 'খুব ভালো, খুব ভালো' বলতে বলতে তরকারি মাখা ভাত আরও কয়েক গ্রাস গিলে বুড়ো। একটু পরে আস্তে আস্তে গলা চুলকাতে শুরু করে বুড়োর। চুলকানি বাড়তেই থাকে। শেষে অসহ্য হয়ে বুড়িকে ডাকে—'হনুবি, হনুবি, হেন্তাক, হেন্তাক (হেন্তাক হলো মানকচুর কাণ্ড কুচি কুচি করে কেটে রোদে শুকিয়ে শুকনো গুঁড়া মাছসহ এক সঙ্গে পিষে গুঁড়ো করে তৈরি করা এক ধরনের বিশেষ খাদ্য, যা খেলে গলার চুলকানি কমে যায়)'। হনুবি হেন্তাক এনে দিলে বুড়ো তাড়াতাড়ি তা খেয়ে নেয়। তাতে কিছুটা স্বস্তি আসে। বুড়ি একটু অবাক হয়ে বলে, 'কী ব্যাপার, এতো যত্ন করে রান্না করলাম, তারপরও গলা চুলকালো। দেখিতো আমি একটু খেয়ে।' এই বলে বুড়ি নিজে ভাত বেড়ে কচুশাক তরকারি নিয়ে খেতে বসে। কয়েক গ্রাস সেও খেয়ে নেয়; তার মনে হয়, ভালোই তো হয়েছে তরকারি, কই চুলকানি তো নেই। কিন্তু একটু পরেই তারও গলা চুলকাতে শুরু করে। সেও চিৎকার দিয়ে ওঠে, 'হনুবা, হনুবা, হেন্তাক হেন্তাক'। বুড়ো তাড়াতাড়ি হেন্তাক এনে দেয়, খেয়ে কিছুটা স্বস্তি পায় বুড়ি।

বুড়ো-বুড়ি দু'জনেই বুঝে যায়, বানর-নাতিরা তাদেরকে ঠকিয়েছে। রাগে গরগর করে বুড়ো; এর প্রতিশোধ নিতে হবে। দু'জনে মিলে পরিকল্পনা করে। সেই অনুযায়ী বুড়ো ঘরের ভিতরে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। চাদরের ভেতরে লুকিয়ে হাতে ধরে রাখে একটি শক্ত লাঠি। আর বুড়ি ঘরের দাওয়ায় বসে গলা ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'আমার সব শেষ হয়ে গেলো গো, সব শেষ হয়ে গেলো। এখন কী হবে গো আমার? হনুবা, তুমি কেন আমাকে একা ফেলে চলে গেলে? এখন কী করবো আমি?' বুড়ি জোরে আরও জোরে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে থাকে আর বলতে থাকে, 'হনুবা, কেন তুমি এমন করে চলে গেলে? এখন কী হবে আমার?' বানরবাহিনী একটু একটু করে বেরিয়ে আসে বনের ভেতর থেকে। আস্তে আস্তে বুড়ির কাছে এসে গোল করে বসে। বুড়ির কান্না একটু থামলে এদের একজন জিজ্ঞেস করে, 'ইবেন (দাদি), কী হয়েছে, কাঁদছো কেন?'

'ইশুশা (নাতিরা), আর বলো না,' বলেই আবার কাঁদতে শুরু করে বুড়ি। কান্নার বেগ একটু কমে এলে বলে, 'তোমাদের ইপু আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন কী হবে গো আমার? কীভাবে বাঁচবো আমি?' আবার শুরু হয় বুড়ির কান্না।

'কিন্তু কীভাবে এমনটি হলো ইবেন? কাল তো ইপুকে ভালোই দেখলাম।'

'আর বলো না, মুখির ছরা লাগিয়ে কাল রাতে তো আমরা খেয়েদেয়ে সকাল

সকাল শুয়ে পড়েছি। ঘুম থেকে উঠতেই দেখি, তোমাদের কথামতো আমাদের খেতে বড় বড় কচুর গাছ। সুন্দর লকলক করছে। তোমাদের ইপুকে ডেকে তুললাম। ইপুও দেখে খুব খুশি হলো। বললো, সুন্দর দেখে কচুর কয়েকটি ডাঁটা তুলে নিয়ে তরকারি রান্না করতে। আমিও তা-ই করলাম। আর সেই তরকারি খেয়েই তোমাদের ইপুর এই অবস্থা।'

বুড়ির কথা শুনে বানরবাহিনীর সত্যিই মন খারাপ হয়ে যায়। তাদের কারণেই আজ নিরীহ বুড়ো মানুষটা মারা গেলো। বুড়িকে সান্ত্বনা দিয়ে তারা বলে, 'ইবেন, যা হবার তো হয়ে গেছে, এখন আর কান্নাকাটি করে কী হবে? এখন বলো, আমরা তোমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'দেখো ইশুরা, তোমরা ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই। তোমাদের ইপুতো ঘরের ভেতর মরে পড়ে আছে। এখন তাকে বের করে এনে সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। তোমরা যদি এ-ব্যাপারে একটু সাহায্য করো।'

'কী যে বলো না ইবেন তুমি! এসব নিয়ে তুমি একটুও ভেবো না। আমরাই সব ব্যবস্থা করবো।' এই বলে বানরবাহিনী ঘরের ভেতর গিয়ে মরার ভান করে পড়ে থাকা দাদুকে ধরে বাইরে আনতে যায়। দাদু এতোক্ষণ সবকিছু শুনে চুপচাপ শুয়ে ছিল সুযোগের অপেক্ষায়। যেই বানরের দল কাছে গিয়ে ধরতে যাবে অমনি বুড়ো উঠে হাতের লাঠি দিয়ে বানরবাহিনীকে দমাদম পিটাতে থাকে। লাঠির বাড়ি খেয়ে বানরেরা পড়িমরি করে পালিয়ে যায়।

রাগ করে লাঠি মেরে বানরদেরকে তাড়িয়ে তো দিয়েছে সত্য, কিন্তু এরপর? যদি তারা দল বেঁধে আবার ফিরে আসে প্রতিশোধ নিতে? এবার বুড়ো-বুড়ি সত্যিই ভয় পেয়ে যায়। নানা পরিকল্পনা করে তারা। শেষে ঘরের ভেতর বাঁশের মাচা দিয়ে বানানো গোপন ছাদে উঠে লুকিয়ে থাকে। বানরের দল সত্যিই ফিরে আসে এবং ঘরের ভেতর ঢুকে বুড়ো-বুড়িকে খুঁজতে থাকে। ঠিক এসময় বহুদিন ব্যবহার না করায় জীর্ণ হয়ে পড়া বাঁশের মাচাটি বুড়ো-বুড়িকে নিয়ে ধপাশ করে পড়ে বানরদের উপর। ভয় পেয়ে বানরেরা পালিয়ে যায় বনে। কিন্তু এতে করে বুড়ো-বুড়ির ভয় আরও বেড়ে যায়। তারা জানে, বানরের দল তাদেরকে ছেড়ে দেবে না। তারা আবার আসবে প্রতিশোধ নিতে। তাই এবার বুড়ো ও বুড়ি একটি বড় 'খারুঙ'-এর (খারুঙ হলো ধান জমিয়ে রাখার জন্য তৈরি করা প্রায় ডিম্বাকৃতির বিশাল মাটির পাত্র) ভেতর ঢুকে মুখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকে। বানরের দল কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে আসে। তারা সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে। মুখ বন্ধ করা বড় 'খারুঙ'টি দেখে তাদের সন্দেহ হয়, বুড়ো-বুড়ি মনে হয় এর ভেতর লুকিয়ে আছে। তাই তারা 'খারুঙ'টিকে গড়িয়ে গড়িয়ে বাইরে নেওয়ার চেষ্টা করে। এসময় বুড়ো ফিসফিস করে বুড়িকে বলে, 'হনুবি,

আমার পাদ দিতে ইচ্ছে করছে'। হনুবি ভয়ে ভয়ে বলে, 'হনুবা, খুব আস্তে'। হনুবা খুব সাবধানে কোনো শব্দ না-করে আস্তে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তখুনি হনুবি আবার ফিসফিসিয়ে বলে, 'হনুবা, হনুবা, আমারও ইচ্ছে করছে।' হনুবা চাপা গলায় বলে, 'খুব সাবধানে'। কিন্তু হনুবির গ্যাস ছাড়ার সময় 'ভট' করে এতো বিরাট শব্দ হয় যে 'খারুঙ'টি ভেঙে খানখান হয়ে যায়। আর বানরবাহিনী বোমা ফেটেছে ভেবে ভয়ে সেই যে পালিয়ে যায় আর কোনোদিন ফিরে আসে না।

বুড়ো-বুড়ি এরপর কোনো ঝামেলা ছাড়াই হাসি-আনন্দে কাটিয়ে দেয় বাকি জীবন।

CamScanner

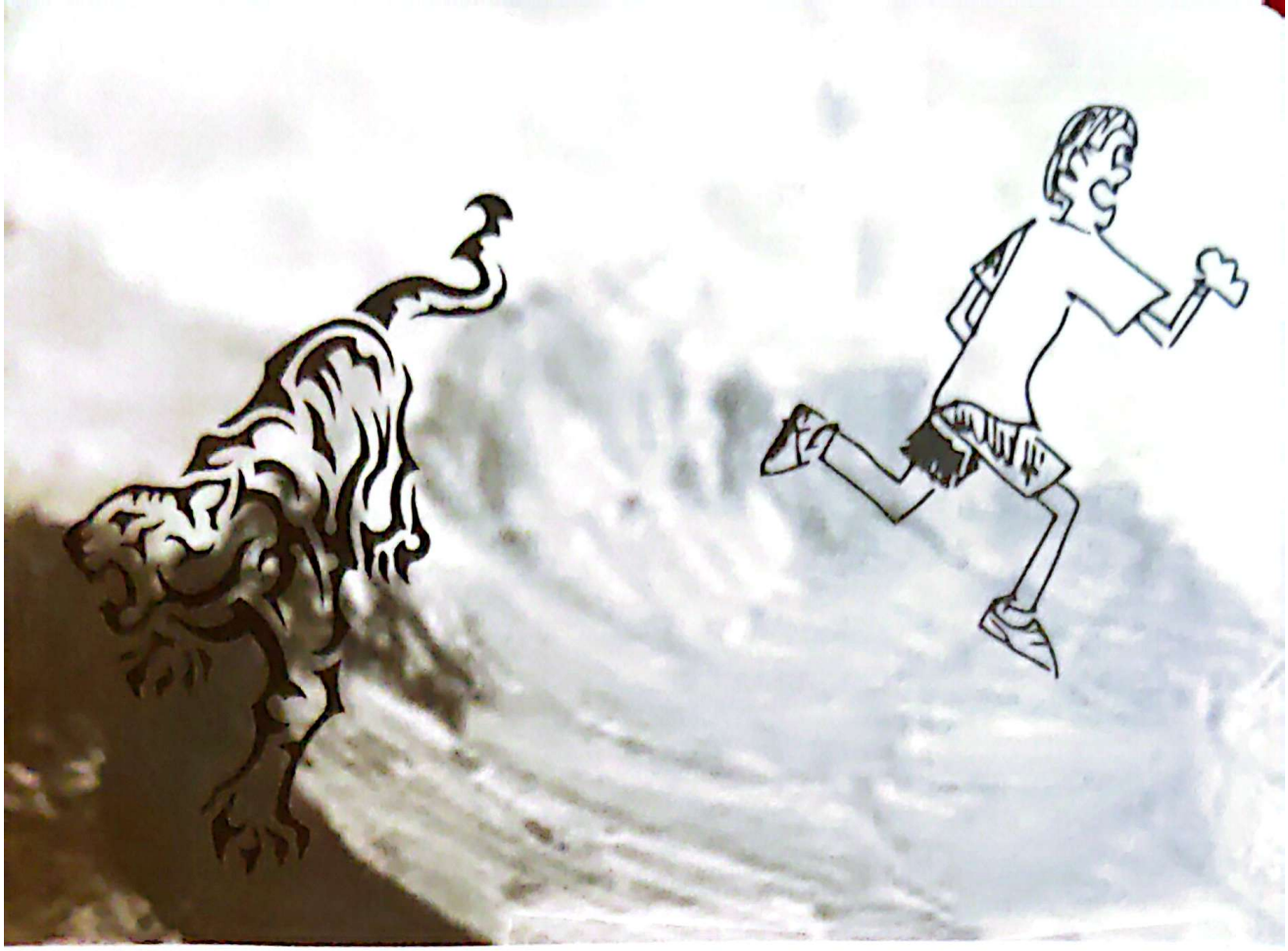

তপ্তা-এর কাহিনি

(তপ্তা: একটি কল্পিত প্রাণী)

একদিন এক গৃহস্থের গোয়ালঘরে একটি বাঘ গরু ধরে খাওয়ার জন্য চুপিচুপি এসে ঢুকেছে। তখনও গৃহস্থের পরিবার সকলে ঘুমিয়ে পড়েনি দেখে সে গোয়ালঘরের এক কোণে ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। ঘরের ভেতর একটি শিশু চিৎকার করে কাঁদছে। মা তার কান্না থামানোর জন্য 'হাতি এলো' 'বাঘ এলো' বলে জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকে। তাতেও শিশুর কান্না থামে না। তাই কোনো উপায় না পেয়ে মা এবার বলতে থাকে—'হাতি এলো, বাঘ এলো, তপ্তা এলো, আর কেঁদো না বাবা'। সঙ্গে সঙ্গে শিশুটির কান্না থেমে যায়।

বাঘটি মনে মনে ভাবে 'তপ্তা'র কথা বলতেই শিশুর কান্না থেমে গেলো! তাহলে নিশ্চয়ই 'তপ্তা' খুব সাংঘাতিক কোনো প্রাণী হবে। ভয়ে তারও বুকে কাঁপন ধরে। এখন যদি সত্যি সত্যি তপ্তা এসে পড়ে। কী হবে তখন?

ঠিক তখনই একটি চোর গরু চুরি করার জন্য চুপি চুপি ওই গোয়ালঘরে এসে ঢুকে। বাঘটি মনে করে এই বুঝি তপ্তা এলো। ভয়ে সে আধমরা হয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে। চোরটি অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে মোটা তাজা গরু খুঁজতে থাকে। বাঘের গায়ে যখন চোরের হাত পড়ে বাঘটির তখন প্রায় মরণাপন্ন অবস্থা। ভয়ে

সে শ্বাস বন্ধ করে শুয়ে থাকে। চোর ভাবলো এটি তো বেশ মোটাসোটা—একেই নেওয়া দরকার। তাই গরু ভেবে সে বাঘটির লেজ ধরে টেনে বের করলো। তারপর বাঘের উপর সওয়ার হয়ে বেরিয়ে পড়লো গোয়ালঘর থেকে।

রাত ভোর হয়ে যাবে তাই বাঘের পিঠে জোরে কঞ্চির বাড়ি দিয়ে দ্রুত ছুটতে থাকলো বাড়ির দিকে। পথে জঙ্গলের রাস্তায় এসে পড়তেই রাত শেষ হয়ে এলো। ভোরের আলো ফুটতেই চোর দেখলো সে বাঘের পিঠে চড়ে আছে। ভয়ে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। কিছু ভাববার আগেই সে ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। তার চিৎকার শুনে বাঘটি ভীষণ ভয় পেয়ে জোরে লাফিয়ে ওঠে। অমনি চোর বেটা বাঘের পিঠ থেকে পড়ে মাটিতে চিটপটাং।

বাঘ কোনো দিকে না-চেয়ে একদৌড়ে ছুটে যায় জঙ্গলের ভিতরে। ভাবে, আজ বড়ো বাঁচা বেঁচে গেছি। চোরও মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে ওঠে আর ভাবে, ইস আজ প্রাণটা বাঁচলো একেবারে কপালগুণেই!

CamScanner

কেইবু কেইওইবা

(বাঘের রূপধারী মানুষ)

এক দেশে থাবাতোন নামে এক সুন্দরী মেয়ে ছিল। সাত ভাইয়ের একমাত্র ছোট বোন সে। ভাইদের আদর-স্নেহে বড় হতে লাগলো অপরূপ সুন্দরী থাবাতোন। কিন্তু ভাইদের মনে সুখ ছিল না। গরিব হওয়ার কারণে তাদের খুব প্রিয় একমাত্র বোনটিকে তারা ঠিকমতো খাওয়াতে-পরাতে পারতো না। এই নিয়ে তাদের মনে সবসময় দুঃখ ছিল। একবার তারা ঠিক করলো টাকা উপার্জনের জন্য তারা সাত ভাই মিলে বাণিজ্য করতে বিদেশে যাবে। তাই তারা থাবাতোনকে সতর্ক করে দিয়ে বললো, রাতে দরজায় সাতটি অর্গল দিয়ে রাখবে; কারও কথায় দরজা খুলবে না। কেবল আমরা ফিরে এসে যখন বলবো, 'থাবাতোন, প্রিয় বোনটি আমাদের, আমরা তোমার সাত ভাই বিদেশ থেকে ফিরে এসেছি, দরজা খোলো; তখনই শুধু দরজা খুলবে।' সাত ভাই থাবাতোনের জন্য কিছু খাবার জোগাড় করে দিয়ে একদিন খুব ভোরে বাণিজ্যের জন্য বিদেশযাত্রা করলো।

থাবাতোনদের গ্রাম থেকে একটু দূরে জঙ্গলের ভেতর থাকতো 'কেইবু কেইওইবা' নামের এক অদ্ভুত প্রাণী। বাঘের মতো মাথা তার আর মানুষের মতো

শরীর। দিনের বেলা সে মানুষের মতো চলতো, কিন্তু রাত হলেই সে হয়ে যেতো বাঘ। প্রতিদিন রাতে 'কেইবু কেইওইবা' বাঘের রূপে শিকারে বেরুতো আর এক-একটি প্রাণী শিকার করে ফিরতো। তার নামে সবাই ভয়ে কাঁপতো। এক রাতে সে শিকারে গিয়ে ঢুকে পড়লো গ্রামের এক প্রান্তে থাকা এক বুড়ির বাড়িতে। বুড়িকে দেখেই হুংকার ছাড়লো সে, 'বুড়ি, ও বুড়ি, আজ আমি তোমাকে খাবো।'

কেইবু কেইওইবাকে দেখে বুড়ি তো ভয়ে অস্থির। কিন্তু চালাক বুড়ি একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে বুদ্ধি করে বললো, 'আরে বোকা কেইবু কেইওইবা, এই বুড়িকে খেয়ে কী হবে? দেখছ না, আমার চামড়াগুলো ঝুলে গেছে; শরীরে কোনো মাংস নেই। খেয়ে কোনো মজাই পাবে না। তার চেয়ে বরং তুমি সুন্দরী থাবাতোনকে খাও গিয়ে।'

অবাক হয় কেইবু কেইওইবা, 'কে থাবাতোন? কোথায় থাকে সে?'

বুড়ি বলে, 'থাবাতোন হলো এই গ্রামের সবচেয়ে সুন্দরী যুবতী। গ্রামের ওই পাশে তার বাড়ি। তবে সাবধান, তার কিন্তু সাহসী শক্তিশালী সাত ভাই আছে। কিন্তু এখন গেলে থাবাতোনকে একাই পাবে। কারণ, তার ভাইরা বিদেশে বাণিজ্য করতে গেছে। সুতরাং যাও, এটাই তোমার সুযোগ।'

কেইবু কেইওইবা খুশি হয়ে লাফাতে লাফাতে চলে যায় থাবাতোনের বাড়ি। কিন্তু থাবাতোনের ঘরের দরজা সাতটি অর্গল দিয়ে শক্ত করে বন্ধ। কেইবু কেইওইবা চেষ্টা করেও তা ভাঙতে পারে না। অনেক ডাকাডাকি করেও থাবাতোনকে দিয়ে দরজাও খোলাতে পারে না। ব্যর্থ হয়ে গজরাতে গজরাতে ফিরে আসে বুড়ির বাড়ি। এসেই হুংকার ছাড়ে—'ও বুড়ি, কী হলো, অনেকতো ডাকাডাকি করেছি। থাবাতোন দরজা খোলে না, ভাঙতেও পারি না। আজ তোমাকেই খাবো বুড়ি।'

বুড়ি ঘাবড়ে যায়। তারপরও অনেক কষ্টে নিজেকে স্বাভাবিক করে বলে, 'ওভাবে হবে না বোকা কেইবু কেইওইবা। একে একে সব ভাই যাওয়ার আগে থাবাতোনকে বলে গেছে সাতটি অর্গল দিয়ে দরজা বন্ধ করে রাখতে। আর এমনি ডাকাডাকি করলে তো খুলবে না সে। বলতে হবে, থাবাতোন, প্রিয় বোনটি আমাদের, আমরা তোমার সাত ভাই বিদেশ থেকে ফিরে এসেছি, দরজা খোলো; তাহলেই সে দরজা খুলবে।'

'তাই বুঝি!' কেইবু কেইওইবা আবার ছুটে যায় থাবাতোনের বাড়ি। তারপর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভাইদের মতো করে বলে, 'থাবাতোন, প্রিয় বোনটি আমাদের, আমরা তোমার সাত ভাই বিদেশ থেকে ফিরে এসেছি, দরজা খোলো।' কিন্তু থাবাতোন কেইবু কেইওইবার খসখসে কণ্ঠ শুনে চিনে ফেলে। বলে, 'আমি আমার ভাইদের কণ্ঠস্বর চিনি। তুমি আমার ভাই নও। আমি দরজা খুলবো না।'

CamScanner

কেইবু কেইওইবা আবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় বুড়ির বাড়ি। হুংকার ছেড়ে বলে, 'ও-তো দরজা খোলে না বুড়ি। আমি আজ তোমাকেই খাবো।'

বুড়ি প্রমাদ গোনে। ভাবে এবার বুঝি আর রক্ষা নেই। কিছুক্ষণ ভেবে বুড়ি বলে, 'ঠিক আছে, চলো আমার সঙ্গে। আমি দরজা খোলার ব্যবস্থা করছি। তবে তুমি কোনো কথা বলবে না। দরজা একটু ফাঁক হলেই তুমি ঠেলে ভেতরে ঢুকে যাবে।'

কেইবু কেইওইবা ভাবে, দেখি বুড়ি কী করে। দু'জনে পৌঁছে যায় থাবাতোনের বাড়ি। বুড়ি খুব নরোম সুরে থাবাতোনকে ডাকে, 'থাবাতোন, প্রিয় নাতিন আমার, শোনো, দরজাটা একটু খোলো না; তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।'

ভেতর থেকে থাবাতোন বলে, 'কী হলো দাদি, দরজা খুলতে পারবো না। যা বলার বাইরে থেকেই বলো।'

'আরে নাতিন, আমার কাঁথাটা ছিঁড়ে গেছে। একটু সেলাই করবো বলে সুঁই-সুতো খুঁজতে গিয়ে আর পাচ্ছি না। তোমার সুঁই-সুতোটা একটু দাও না। নাহলে যে এই শীতের রাতে কাঁথা গায়ে না-দিয়ে আমাকে কষ্ট পেতে হবে।'

'ঠিক আছে দাদি, আমি দরজার ফাঁক দিয়ে এগিয়ে দিচ্ছি, তুমি নিয়ে নাও।'

বুড়ি চিৎকার দিয়ে ওঠে, 'না না নাতিন, ওভাবে দিয়ো না। একে তো বুড়ি, চোখে কম দেখি; তার ওপর এই রাতে ওভাবে ফেলে দিলে আমি সুঁই-সুতো খুঁজে পাবো না। তুমি দরজাটা একটু ফাঁক করে হাতটা বাড়িয়ে দাও, আমি নিয়েই চলে যাবো।'

থাবাতোনের মায়া হয় বুড়ির জন্যে। ভাবে, ঠিকইতো। দরজা না হয় একটু ফাঁক করেই দিই বুড়িকে, অসুবিধা কী। এই ভেবে থাবাতোন দরজা একটু ফাঁক করে হাত বাড়িয়ে বুড়িকে যেই সুঁই-সুতো দিতে যাবে তখনই পেছনে ওত পেতে থাকা কেইবু কেইওইবা এক ধাক্কায় দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে। তারপর সুন্দরী যুবতী থাবাতোনকে কাঁধে তুলে নিয়ে জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা দেয়। থাবাতোন হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বুড়িকে শাপ-শাপান্ত করতে থাকে। কারণ, বুড়ির কারণেই তার এই অবস্থা। বুদ্ধিমতী থাবাতোন যাওয়ার পথে তার পরনের কাপড় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যায় যাতে তার ভাইয়েরা তার সন্ধান করতে পারে। জঙ্গলে গিয়ে কেইবু কেইওইবা থাবাতোনকে তার বাড়িতে আটকে রাখে। এদিকে থাবাতোনের সাত ভাই ক'দিন পরেই বাণিজ্য থেকে ফিরে এসে থাবাতোনকে ঘরে না পেয়ে পাগলের মতো খুঁজতে থাকে। শেষে থাবাতোনের ফেলে যাওয়া কাপড়ের টুকরো দেখে দেখে তারা পৌঁছে যায় জঙ্গলের ভেতর কেইবু কেইওইবার বাড়িতে। দূর থেকে লুকিয়ে তারা তাদের প্রিয় বোনকে দেখে। কিন্তু কেইবু কেইওইবার ভয়ে কাছে যেতে পারে না। থাবাতোনও

দূর থেকেই ভাইদেরকে দেখে। পরেরদিন থাবাতোন হাসি-খুশি ভাব নিয়ে কথা বলে কেইবু কেইওইবার সঙ্গে। খুশি হয় কেইবু কেইওইবা। ভাবে, থাবাতোন মনে হয় তাকে ভালোবেসে ফেলেছে। তাই থাবাতোন যখন বলে, 'আমাকে একজন বুড়ির কুঁচকানো চামড়া এনে দাও, আমি তা দিয়ে একটি ঢোল বানাবো', তখন কেইবু কেইওইবা কোনো কিছু না ভেবে লাফাতে লাফাতে চলে যায় বুড়ির বাড়ি। তারপর বুড়িকে মেরে তার চামড়া নিয়ে আসে থাবাতোনের জন্য। থাবাতোন খুশি হয়ে বলে, 'ঠিক আছে, এবার তুমি নদী থেকে এই বাঁশের চোঙা ভরে পানি নিয়ে এসো। সেই পানি দিয়ে বুড়ির চামড়া ধুয়ে তারপর ঢোল বানাবো।' এই বলে থাবাতোন দুই মুখ খোলা একটি বাঁশের চোঙা কেইবু কেইওইবার হাতে ধরিয়ে দিলো।

কেইবু কেইওইবা সরল মনে দুই মুখ খোলা বাঁশের চোঙা নিয়ে নদীতে যায়। চোঙায় পানি ভরে যেই নিয়ে আসবে অমনি অপর প্রান্ত দিয়ে পড়ে যায় সব পানি। বোকা কেইবু কেইওইবা বার বার পানি ভরে, বার বারই পড়ে যায়। এদিকে আগের কথা অনুযায়ী থাবাতোনের সাত ভাই লুকিয়ে চলে আসে বোনকে নিতে। তারা বুড়ির চামড়া ঘরের ভেতর রেখে আগুন লাগিয়ে দেয় ঘরে এবং ছুটতে ছুটতে চলে যায় গ্রামে।

কেইবু কেইওইবার কাণ্ড দেখে করুণা হয় কাকের। সে জোরে জোরে ডেকে বলে, 'ওরে বোকা, দুই মুখ খোলা চোঙায় কি পানি ভরা যায়? এদিকে যে তোমার ঘর পুড়লো, বউও পালিয়ে যায়।'

কাকের কথা শুনে কেইবু কেইওইবা বুঝতে পারে, তার বউ তাকে ঠকিয়েছে। সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায় বাড়িতে। দেখে দাউ দাউ করে জ্বলছে তার বাড়ি। সেই আগুনে পুড়ে যায় বুড়ির চামড়া। চামড়া পোড়ার গন্ধে কেইবু কেইওইবার মনে হয় এই আগুনে পুড়ে গেছে তার প্রিয় বউ, থাবাতোন। বউকে বাঁচাতে কেইবু কেইওইবা 'থাবাতোন, থাবাতোন' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুনে। দুষ্টু বুড়ির চামড়ার সঙ্গে আগুনে পুড়ে মারা যায় বদ-স্বভাবের কেইবু কেইওইবাও।

অতঃপর সাত ভাইয়ের সঙ্গে সুখে-আনন্দে দিন কাটতে থাকে সুন্দরী থাবাতোনের।

CamScanner

আঁকা : সরকার সজীব

খাম্ব্রেনচাক

(এক ধরনের পাখি)

এক বনে বাস করতো এক খাম্ব্রেনচাক পাখি। সে ছিল খুব সুন্দরী। সাজগোজ করার ব্যাপারেও ছিল তার ভীষণ আগ্রহ। সে সব সময় হাত-পা-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করতো। একদিন বাপের বাড়ি যাবে বলে সে নদীর ঘাটে গেল গোসল করতে। ঘাটে নেমে খাম্ব্রেনচাক একটি মসৃণ পাথরের ওপর পা রেখে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে লাগল। কিন্তু আসলে সেটি পাথর ছিল না, ছিল একটি বড়সড় কাঁকড়া। এর একটু আগে নদী পেরুতে গিয়ে ব্রাহ্মণের গরুর পাল কাঁকড়াটিকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছে। তার ব্যথা এখনও যায়নি। এই অবস্থায় একটি পাখি এসে আবার তার পিঠে সওয়ার হয়েছে। রাগে-ক্ষোভে কাঁকড়াটি শক্ত আঙুলের চিমটা দিয়ে জোরে কামড়ে দেয় পাখির পা। খাম্ব্রেনচাকের পা কেটে রক্ত ঝরতে থাকে। ব্যথায় চিৎকার করতে করতে উড়ে গিয়ে বসে একটি আমড়া গাছের ডালে। সেখানে অনেক বড় বড় আমড়া ঝুলছিল। খাম্ব্রেনচাকের পায়ের রক্ত টপটপ করে গিয়ে পড়ে আমড়ার ওপর। প্রচণ্ড ঘেন্নায় আমড়াটি বোঁটা থেকে ছিঁড়ে গিয়ে পড়ল সোজা বিষাক্ত পিঁপড়ার স্তূপের ওপর। 'কে এই কাজ করল'

বলে রাগে গরগর করতে করতে বেরিয়ে পড়ল সব পিঁপড়া। দেখে, কাছেই শুয়ে আছে একটি বন্য শূকর। সব রাগ গিয়ে পড়লো তার ওপর। পিঁপড়াবাহিনী মিলে আক্রমণ করল বন্য শূকরটিকে। পিঁপড়ার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে শূকরটি দৌড়ে গিয়ে একটি কলাগাছের ঝাড় তছনছ করে দিল। কলাগাছ ভেঙে গিয়ে পড়ল বাঁশের বেড়ার ওপর, আর বেড়া উপড়ে গিয়ে পড়লো পুকুরে। গৃহস্থ বেরিয়ে দেখে তার সবকিছু ভেঙে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। সে গিয়ে নালিশ জানালো রাজার কাছে।

গৃহস্থের সব কথা শুনে রাজা বিচারসভা বসালো। বাঁশের বেড়াকে জিজ্ঞেস করল 'তুমি কেন উপড়ে গিয়ে পুকুরে পড়লে?'

রাজার কথা শুনে বেড়া বললো, 'মহারাজ আমার কোনো দোষ নেই। কলাগাছ ভেঙে পড়ে গেলো আমার ওপর, তাইতো আমি পুকুরে পড়েছি।'

'হুম!', রাজা বলে, 'তাহলে কলাগাছ তুমি কেন বেড়ার ওপর ভেঙে পড়লে?'

'মহারাজ, আমারও দোষ নেই। শূকর এসে আমাদের ঝাড় তছনছ করে দিয়েছে', বলে কলাগাছ।

'ও, তাই বুঝি! তাহলে তো শূকর তোমারই সব দোষ।' রাজা হুংকার ছাড়ে।

'না না মহারাজ, আমি নই, পিঁপড়ারই সব দোষ। আমিতো ঘুমিয়েই ছিলাম। পিঁপড়ারা এসে আমাকে এমনভাবে কামড় দিয়েছে যে আমি ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে কলাগাছের ঝাড়ে গিয়ে পিঠ চুলকাতে গিয়েই এই অবস্থা হয়েছে।' শূকর অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কথাগুলো বলে।

রাজা মহাশয় মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলে, 'ঠিক ঠিক। তাহলে পিঁপড়া, তোমরা শূকরকে কামড়াতে গেলে কেন?'

মুখ কাঁচুমাচু করে পিঁপড়ার রাজা বলে, 'মহারাজ, আমরা আমাদের প্রাসাদেই নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ গাছ থেকে একটি আমড়া এসে পড়ে আমাদের প্রাসাদের ওপর। সব ভেঙে খানখান হয়ে যায়। আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি কে করেছে এই কাজ। বাইরে বেরোতেই দেখি একটি শূকর শুয়ে আছে। আমরা তাকেই দায়ী মনে করে কামড়ে দিয়েছি।'

'ও এই কথা। তা বাবা আমড়া তুমি পিঁপড়ের প্রাসাদের ওপর পড়তে গেলে কেন?'

'মহারাজ, একটি পাখি এসে বসে গাছের ডালে। তার পা থেকে রক্ত পড়ছিল। রক্তের কয়েকটি ফোঁটা এসে পড়ে আমার ওপর। ঘেন্নায় কুঁচকে ওঠি আমি। আর তখনই বোঁটা ছিঁড়ে পড়ে যাই নিচে ঠিক পিঁপড়াদের প্রাসাদের ওপর। আমার কিছু করার ছিল না মহারাজ।'

আমড়ার কথা শুনে রাজা বলে, 'কে সেই পাখি? খাম্রেনচাক তুমি?'

ভয়ে জড়সড় হয়ে খাম্রেনচাক অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'মহারাজ, আমি আজ

CamScanner

বাপের বাড়ি যাবো বলে নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছিলাম। একটি মসৃণ চকচকে পাথর ভেবে যেই না আমি একটি বড় কাঁকড়ার পিঠের ওপর পা রেখে ঘষতে শুরু করেছি অমনি সেই কাঁকড়া তার শক্ত আঙুল দিয়ে চিমটি মেরে আমার পায়ে কামড়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত পড়তে শুরু করে। আমি ব্যথায় ককাতে ককাতে কোনোরকম উড়ে গিয়ে আমড়া গাছের ডালে বসি। এর পরে আর কিছু জানি না আমি।'

'হুম!' রাজা চিন্তিত হয়। 'তাহলে কাঁকড়াকে খবর দাও, সে কেন এরকম করল?'

রাজার খবর পেয়ে কাঁকড়া খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসে। 'মহারাজ, একটু আগে ব্রাহ্মণের গরুর পাল ছুটতে ছুটতে চলে গেল নদী পেরিয়ে। তখন একটি গরু পায়ের তলায় পিষ্ট করে আমাকে। ব্যথায় যখন কাতরাচ্ছিলাম তখনই এ পাখিটি এসে আমার পিঠের ওপর পা তুলে বসে। আমার সব রাগ গিয়ে পড়ে এই খাম্রেনচাকের ওপর। তাই তার পা কামড়ে দিই। আমাকে দোষ দেবেন না মহারাজ, রাগের বশেই আমি কাজটি করেছি।'

কাঁকড়ার কথা শুনে রাজা গরুকে ডেকে বলে, 'তুমি এই কাঁকড়াটিকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছো কেন?'

রাজার কথা শুনে গরু হাম্বা হাম্বা ডেকে বলে, 'হঠাৎ করে ঝড়-বৃষ্টি আসায় আমরা পাগলের মতো ছুটতে শুরু করি। তখন খেয়াল করিনি কী করে যে কাঁকড়াটি আমার পায়ের তলায় পড়েছে। আমাকে ক্ষমা করুন মহারাজ; দোষ আমার নয়, সব দোষ ওই ঝড়-বৃষ্টির। সে হঠাৎ করে আসাতেই এই বিপত্তি হয়েছে।'

'ঠিক বলেছো তুমি। কোথায় ঝড়-বৃষ্টি? কেন তোমরা অসময়ে হঠাৎ করে এলে? জবাব দাও।' রাজার গম্ভীর কণ্ঠ গমগম করে ওঠে।

'মহারাজ, ব্যাঙ অনেকক্ষণ ধরে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করে ডাকছিল। আর ব্যাঙ ডাকলে বৃষ্টি হয়, এটাই তো নিয়ম মহারাজ। তাই ব্যাঙের ডাক শুনে থাকতে না পেরে আমরা এভাবে ছুটে এসেছিলাম', ঝড়-বৃষ্টি মিনমিনে গলায় বলে।

'ব্যাঙ তুমি ডাকছিলে কেন?'

'কেন মহারাজ? আমার তো এটা ডাকার সময়, তাই ডাকছিলাম। আবারও ডাকবো—ঘ্যাঙর, ঘ্যাঙর ...'

CamScanner

শন্দ্রেম্বী ও চাইশ্রা

এক রাজ্যে রাজার এক পারিষদ ছিল। তার ছিল দুই স্ত্রী, য়াংখুরেইমা ও শাংখুরেইমা। দুই বউয়েরই একজন করে কন্যাসন্তান ছিল। বড় বউ য়াংখুরেইমার মেয়ের নাম শন্দ্রেম্বী, আর ছোট বউ শাংখুরেইমার কন্যা চাইশ্রা।

শন্দ্রেম্বী ছিল খুবই সুন্দরী আর তার মায়ের মতোই গুণবতী, মিষ্টি স্বভাবের। সবাই তাকে ভালোবাসতো। আর শাংখুরেইমার কন্যা চাইশ্রা দেখতে যেমন কুৎসিত ছিল, তেমনই ছিল তার মায়ের মতোই কুটিল স্বভাবের। শাংখুরেইমা ও তার মেয়ে চাইশ্রা য়াংখুরেইমা ও শন্দ্রেম্বীকে খুব ঈর্ষা করতো এবং সব সময়ই তাদের ক্ষতি করার চেষ্টায় থাকতো।

শন্দ্রেম্বী ও চাইশ্রা রাজপুরুষ পিতার স্নেহচ্ছায়ায় এবং আরাম-আয়েশে বড় হতে থাকে। কিন্তু মানুষের জীবন সবসময় একরকম থাকে না। আর তাই পিতা হঠাৎ করে মারা গেলে এই পরিবারে নেমে আসে চরম দারিদ্র্য। য়াংখুরেইমা ও শাংখুরেইমাকে এখন সংসার চালানোর জন্য সারাদিনই খাটাখাটনি করতে হয়। দুই বোনে মিলে বন থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ এবং খাল-বিল থেকে মাছ ধরে সেগুলো বিক্রি করে সংসার চালায়। এ-সব কাজে শন্দ্রেম্বী আর চাইশ্রাও নানাভাবে সাহায্য করে। কিন্তু তারপরও শাংখুরেইমা আর চাইশ্রা সবসময় তৎপর থাকে কী করে শন্দ্রেম্বী আর তার মা'র অনিষ্ট করা যায়।

একদিন য়াংখুরেইমা ও শাংখুরেইমা বাঁশ ও বেতের তৈরি মাছ ধরার উপকরণ

'লোং' ও মাছ রাখার পাত্র 'তুঙ্গোল' (খালুই) নিয়ে বিলে মাছ ধরতে যায়। দু'জনে অনেক সময় নিয়ে মাছ ধরে। য়াংখুরেইমার 'তুঙ্গোল' নানা জাতের মাছে ভরে যায়। কিন্তু শাংখুরেইমার 'লোং'-এ কোনও মাছ উঠে না, শুধু সাপ ধরা পড়ে। ফলে, শাংখুরেইমার 'তুঙ্গোল' ভর্তি হয় নানা রকম সাপে। এদিকে বেলা গড়িয়ে যায়। দু'জনে বিল থেকে ওঠে বাড়ির পথ ধরে। পথে একটি ডুমুর গাছ। সেখানে অনেক পাকা ডুমুর ঝুলছে। শাংখুরেইমা বলে, 'দিদি, দেখো কী সুন্দর পাকা ডুমুর। তুমি একটু নিচে বসো, আমি গাছে উঠে কয়েকটি পাকা ডুমুর পেড়ে আনি।' এই বলে তড়তড় করে গাছে উঠে যায় সে। উপর থেকে পাকা ডুমুর পেড়ে নিজে খায় এবং তার দিদি য়াংখুরেইমার জন্য কয়েকটা ফেলে দেয়। পাকা মিষ্টি ডুমুর খেয়ে দু'জনই খুশি হয়। এবার গাছের ডালে বসে শাংখুরেইমা নিচে বসা তার দিদিকে বলে, 'দিদি, তুমি চোখ বন্ধ করে উপরের দিকে হা করে গাছের নিচে দাঁড়াও। আমি কয়েকটি টসটসে পাকা ডুমুর ফেলে দিচ্ছি, খেয়ে খুব মজা পাবে।' সহজসরল য়াংখুরেইমা ছোট সতীনের কথায় বিশ্বাস করে চোখ বন্ধ করে হা করে দাঁড়ায়। আর দুষ্টু শাংখুরেইমা তার 'তুঙ্গোল' উপুড় করে সমস্ত সাপ ঢেলে দেয় দিদির ওপর। সাপের কামড়ে মারা যায় য়াংখুরেইমা। শাংখুরেইমা গাছ থেকে নেমে মৃত দিদিকে বিলের পানিতে ফেলে দিয়ে তার মাছভর্তি 'তুঙ্গোল' নিয়ে মহানন্দে বাড়ি ফিরে।

চাইশ্রার মাকে একা ফিরতে দেখে শন্দ্রেম্বী উদ্‌বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'মা কোথায় ইমাতোন (ছোট মা বা সৎমা)? ফেরেনি এখনও?'

শাংখুরেইমা তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, 'আর বলো না, তোমার মায়ের তো লোভের শেষ নেই। কতো করে বললাম চলো দিদি। কিন্তু শুনলে তো! আরও নাকি মাছ ধরবে, তাই সে বিলেই রয়ে গেছে।'

মা'র জন্য অপেক্ষা করতে করতে রাত গড়িয়ে গেলো। কিন্তু মায়ের ফেরার কোনো নাম নেই। এদিকে চাইশ্রা ও তার মা শন্দ্রেম্বীর মায়ের ধরা মাছগুলো রেঁধে খুব মজা করে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শন্দ্রেম্বী মায়ের জন্য অপেক্ষা করছে আর কাঁদছে; আর কাঁদতে কাঁদতেই একসময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে-ও। স্বপ্নে মা এসে দেখা দিল তাকে। বলল, 'মামণি, তুমি খাওয়াদাওয়া ছেড়ে কেঁদে কেঁদে অপেক্ষা করছ আমার জন্য। কিন্তু আমি তো আর বেঁচে নেই। তোমার ইমাতোন তুঙ্গোল থেকে সাপ ঢেলে দিয়ে আমাকে মেরে ফেলেছে আর আমার তুঙ্গোল ভর্তি মাছ নিয়ে গেছে। আমি এখন ছোট এক কচ্ছপের রূপ ধরে বিলে আছি। তুমি কাল সকালে লোং নিয়ে মাছ ধরতে আসবে আর আমাকে ধরে নিয়ে লুকিয়ে বাড়িতে একটি মাটির পাত্রে জল দিয়ে পাঁচ দিন জিইয়ে রাখবে। পাঁচ দিন পর আমি আবার তোমার মায়ের রূপে ফিরে আসব।'

CamScanner

ভোর হতেই শন্দ্রেম্বী লোং নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বিলে মাছ ধরতে। এক একবার খেপ দেয় আর এক-একটি ছোট মাছ ধরা পড়ে তার লোং-এ। শন্দ্রেম্বী মাছগুলোকে খুব আদর করে বলে, 'হে ছোট মাছ, আমি তো তোমাকে ধরার জন্য লোং-এর খেপ মারিনি। আমি কচ্ছপরূপী আমার মাকে ধরার জন্য এসেছি। তুমি আমার মাকে এনে দাও।' এই বলে খুব যত্ন করে মাছগুলোকে বিলের জলে ছেড়ে দেয়। অনেকক্ষণ খেপ দেওয়ার পর শন্দ্রেম্বীর লোং-এ ধরা পড়ে ছোট কচ্ছপটি। খুব খুশি হয়ে শন্দ্রেম্বী কচ্ছপটিকে তুঙ্গোলে না ভরে ফানেকের (মণিপুরি মেয়েদের পরনের কাপড়) আড়ালে রেখে বাড়িতে ফিরে আসে। সৎমা জিজ্ঞেস করে, 'কী মাছ ধরেছো দেখি শন্দ্রেম্বী।' শন্দ্রেম্বী তার খালি তুঙ্গোল দেখিয়ে বলে, 'না ইমাতোন, কোনো মাছ পাইনি। দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে খালি হাতেই ফিরে এসেছি।' শন্দ্রেম্বী কোনো মাছ পায়নি শুনে খুশি হয় শাংখুরেইমা। 'যাও, রান্না বসাও গিয়ে' বলে সৎমা চলে গেলে শন্দ্রেম্বী লুকিয়ে কচ্ছপটিকে রান্নাঘরের পাশেই একটি জলভরা হাঁড়িতে রেখে দিল।

কিন্তু আড়াল থেকে চাইশ্রা সবকিছু দেখে ফেলে আর মাকে সব জানিয়ে দেয়। তখন চাইশ্রার মা তার মেয়েকে শিখিয়ে দিল এই বলে যে, 'কাল সকালে তুমি দিদির জলপাত্র থেকে জল খাবে বলে বায়না ধরবে আর নিজেই গিয়ে সেখান থেকে জল ঢেলে নেবে। তাহলে তো তুমি দেখতে পাবে ওই পাত্রে কী আছে।' পরদিন সকালে চাইশ্রা তা-ই করল। প্রথমে শন্দ্রেম্বী একটু আপত্তি জানালেও চাইশ্রার মা যখন বলে, 'তোমার ছোট বোনটি একটু জল খেতে চায় তোমার পাত্র থেকে, তাতে তোমার আপত্তি কিসের', তখন আর শন্দ্রেম্বী না করতে পারে না। চাইশ্রা জল নিতে গিয়ে দেখে পাত্রের ভেতর একটি কচ্ছপ। তখন সঙ্গে সঙ্গে সে কান্না জুড়ে দিয়ে বলে, 'মা আমি কচ্ছপের মাংস খাবো। তুমি আমাকে এই কচ্ছপ রান্না করে দাও' বলে জলপাত্র থেকে কচ্ছপটি তুলে আনে। চাইশ্রার মা শন্দ্রেম্বীকে তার ছোট বোনের আবদার মেটানোর জন্য কচ্ছপটি রান্না করতে বলে। নিরুপায় শন্দ্রেম্বী কাঁদতে কাঁদতে জলের হাঁড়িতে জীবন্ত কচ্ছপটি রেখে চুলার ওপর বসিয়ে দেয়। জল ফুটতে শুরু করলে হাঁড়ির ভেতর থেকে কচ্ছপটি বলে ওঠে, 'শন্দ্রেম্বী, মা আমার, তোমার মায়ের প্রাণ যে হাঁটু অবধি উঠে এসেছে।' একথা শুনে শন্দ্রেম্বী কাঁদতে কাঁদতে উনুন থেকে জ্বলন্ত লাকড়িগুলো টেনে বের করে। 'কী করছো, কী করছো' বলে চাইশ্রার মা সেই জ্বলন্ত কাঠ চেপে ধরে শন্দ্রেম্বীর পায়ে। 'ওহ্ মাগো' বলে চিৎকার করে ওঠে শন্দ্রেম্বী, বাধ্য হয়ে জ্বলন্ত লাকড়ি আবার ঠেলে দেয় উনুনের ভেতর। কচ্ছপটি আবার ফুটন্ত হাঁড়ির ভেতর থেকে চাপাকণ্ঠে বলে ওঠে, 'মা'রে, এবার যে আমার প্রাণ কোমর পর্যন্ত উঠে এলো।' শন্দ্রেম্বী তাড়াতাড়ি উনুন থেকে জ্বলন্ত কাঠগুলো টেনে বের করে। সঙ্গে সঙ্গে চাইশ্রার মা

জ্বলন্ত কাঠ চেপে ধরে শন্দ্রেম্বীর পিঠে-মাথায়। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়ে শন্দ্রেম্বী আবার জ্বলন্ত লাকড়ি ঠেলে দেয় উনুনে। ভক ভক করে ফুটতে থাকা হাঁড়ির ভেতর থেকে কচ্ছপটির ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে থাকে, 'মামণি আমার, এবার যে তোর মা'র প্রাণ বুক অবধি উঠে এসেছে; এবার তো গলা অবধি পৌঁছে গেছে; আর পারলাম নারে মা, সব শেষ হয়ে গেল।' কান্না ছাড়া শন্দ্রেম্বীর আর কিছু করার থাকে না। রান্না করা কচ্ছপের মাংস খুব মজা করে খেলো চাইশ্রা ও তার মা। শন্দ্রেম্বী তার অংশের মাংস ও হাড়গোড় গোপনে ফেলে দেয় পেছনের দরজা দিয়ে।

রাতে শন্দ্রেম্বীর স্বপ্নে আবার দেখা দেয় মা। বলে, 'শোন মামণি, তুমি যে কচ্ছপের হাড়-মাংস পেছনের দরজা দিয়ে ফেলে দিয়েছো কাল সকালে খুব গোপনে সেগুলো সংগ্রহ করে একটি পরিষ্কার কাপড়ে জড়িয়ে একটি বাক্সের ভেতর মুখ বন্ধ করে সাতদিন রেখে দিবি। সাতদিন পুরো হলে আমি আবার মানুষের রূপে ফিরে আসবো। বাকি রাত আর ঘুম হলো না শন্দ্রেম্বীর। খুব ভোরে ওঠে সে গোপনে মায়ের কথা অনুযায়ী সবকিছু করলো। এভাবে দিন যায়, শন্দ্রেম্বী মনে মনে গুনে এক..দুই..তিন..। ছ'দিনের মাথায় সে কৌতুহল আর চেপে রাখতে না পেরে বাক্সের মুখ সামান্য খুলে দেখতে গেল, কী হচ্ছে ভেতরে। অমনি 'এ-কী করলে তুমি! আমার আর মানুষের রূপ নেওয়া হলো না' বলে শন্দ্রেম্বীর মা য়াংখুরেইমা চড়ুই পাখির রূপ ধরে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেলো।

দিন কেটে যায়। শন্দ্রেম্বী ও চাইশ্রা দু'জনেই এখন পূর্ণ যুবতী। একদিন দুই বোন কলসি কাঁখে নদীর ঘাটে যায় জল আনতে। শন্দ্রেম্বীর কাঁখে ছিল একটি মাটির কলসি আর চাইশ্রার কাঁখে পিতলের কলসি। ভাগ্যের কী অপূর্ব লিখন! ঠিক তখনই সেই পথ দিয়ে দলবল নিয়ে শিকার থেকে ফিরছিল রাজ্যের যুবক-রাজা। কলসি কাঁখে দুই যুবতীকে বিশেষ করে অপরূপ সুন্দরী শন্দ্রেম্বীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় রাজা। তিনি তার পারিষদদের ডেকে বলেন, 'ওই যে, পিতলের কলসি নয়, মাটির কলসি কাঁখে যে মেয়েটি, তাকেই আমার পছন্দ।' শুনে চাইশ্রার মন খারাপ হয়ে যায়। ঘরে ফিরে গিয়ে সে তার মাকে সব কথা জানায়। চাইশ্রার মা বুদ্ধি করে পরের দিন চাইশ্রাকে মাটির কলসি আর শন্দ্রেম্বীকে পিতলের কলসি দিয়ে পাঠায়। সেদিনও রাজা নদীর ঘাটে এসে উপস্থিত। তাদের দুজনকে দেখে রাজা বলে, 'পিতলের কলসি কাঁখে যে মেয়েটি তাকেই আমার পছন্দ।' এই বলে রাজা শন্দ্রেম্বীকে ঘোড়ায় তুলে সোজা রাজপ্রাসাদে নিয়ে যায়। রাগে দুঃখে অপমানে চাইশ্রা হাতের কলস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাড়িতে ছুটে যায় এবং মাকে সব কথা খুলে বলে। শন্দ্রেম্বীর সৌভাগ্য দেখে মা-মেয়ে দু'জনেই ঈর্ষার আগুনে জ্বলতে থাকে। এদিকে রাজার সঙ্গে শন্দ্রেম্বীর বিয়ে হয়ে যায় খুব ঘটা করে আর তাকে করা হয় রাজ্যের পাটরানি। হাসি-আনন্দে দিন কাটে শন্দ্রেম্বীর। তারপর একসময়

শন্দ্রেম্বীর কোল জুড়ে আসে ফুটফুটে এক ছেলে।

চাইশ্রা আর তার মা কোনোদিনই শন্দ্রেম্বীর ভালো চায়নি। এখন শন্দ্রেম্বীর সৌভাগ্য দেখে তারা হিংসায় মরে যেতে থাকে। সারাক্ষণ চিন্তা করে কী করে শন্দ্রেম্বীর ক্ষতি করা যায়। অনেক ভেবে চাইশ্রার মা শাংখুরেইমা শন্দ্রেম্বীকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে। রাজ্যের পাটরানি শন্দ্রেম্বী সেজেগুজে মূল্যবান গয়নাগাটি পড়ে রাজকীয় পালকিতে চড়ে একাই চলে আসে নেমন্তন্ন খেতে। তার এই সাজগোজ আর মূল্যবান গয়নাগাটি দেখে চাইশ্রা ও তার মায়ের মনের জ্বালা আরও বেড়ে যায়। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর চাইশ্রা দিদির কাছে আবদার করলো, 'দিদি, তোমার পোশাক আর গয়নাগাটিগুলো আমাকে একটিবার দাও না, আমি একটু পরে দেখি কেমন মানায় আমাকে।' ছোট বোনের আবদার ফেলতে না পেরে শন্দ্রেম্বী কাপড়চোপড় আর গয়নাগাটি খুলে চাইশ্রাকে দিল। চাইশ্রা সবগুলো পরে মনের আনন্দে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। শন্দ্রেম্বীর ফিরে যাওয়ার সময় হলে সে তার বোনের কাছে পোশাক ও গয়না ফেরত চাইলো, 'বোনটি আমার, এবার দাওতো আমার পোশাক আর গয়নাগুলো।' একথা শুনে চাইশ্রা কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বললো, 'মহারাণি হয়েছো বলে এতো দেমাক তোমার। ছোট বোন হিসেবে তোমার পোশাক আর গয়নাগুলো কি আমি একটু পরতেও পারবো না।' বলেই সমস্ত পোশাক আর গয়নাগাটি খুলে জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল খাটের নিচে। শন্দ্রেম্বী পোশাক আর গয়না নেওয়ার জন্য যেই না হাঁটু গেড়ে খাটের নিচে হাত বাড়িয়েছে তখনই চাইশ্রার মা তার উপর ঢেলে দিল এক হাঁড়ি ফুটন্ত জল। সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হলো শন্দ্রেম্বীর। চাইশ্রার মা তাড়াতাড়ি শন্দ্রেম্বীর পোশাক আর গয়নাগুলো চাইশ্রাকে পরিয়ে তাকে রানি বানিয়ে রাজপ্রাসাদে পাঠিয়ে দেয়। চাইশ্রার চেহারা আর চালচলন দেখে রাজার কেমন সন্দেহ হয়। কিন্তু কিছু বলে না।

এর ক'দিন পর রাজার দাস ঘাস কাটতে গেলে একটি ঘুঘু পাখির রূপ ধরে শন্দ্রেম্বী গান গাইতে গাইতে বলে—

'ও ভাই রাখাল বালক, শোনো বলি তোমাকে
তোমার রাজা ভুলে গেছে তার আসল রানিকে,
নকল রানি যদি থাকে রাজার ঘরে
শিশু যুবরাজ হঠাৎ যাবে মরে
সোনার মালা আর কাপড় ছিঁড়ে যাবে
হাতি ঘোড়া মাটিতে গড়াগড়ি খাবে।
যাও গিয়ে বলো তোমার রাজাকে
কুক্রু কু কু খাংমৈতৎ'

রাখাল বালক ছুটে এসে রাজাকে সব কথা জানালে রাজা নিজে মাঠে ছুটে গিয়ে

হাতের তালুতে কিছু চাল ছড়িয়ে দিয়ে ঘুঘু পাখিটিকে ডাকতে থাকে—

'ও পাখি, খুবই সুন্দর তোমার রূপের বাহার
তুমিই যদি হয়ে থাকো প্রিয়তমা আমার
তাহলে এসো
উড়ে এসে এই হাতে বসো
আর খুঁটে খুঁটে খাও তোমার জন্য আনা এই আধার।

ঘুঘু পাখিটি কোনোরকম দ্বিধা না করে উড়ে এসে রাজার হাতে বসল এবং আধার খেতে লাগলো। রাজা পাখিটিকে ধরে এনে খাঁচায় পুড়ে রেখে দিল। রাতে রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিলো শন্দ্রেম্বী; বলল 'মহারাজ, আমার প্রিয়তম, আমাকে যদি এভাবে সাতদিন রেখে দিতে পারেন তাহলে আমি আবার মানুষের রূপ ফিরে পাবো।'

রাজা প্রতিদিন খাঁচার পাখিটিকে আদর-যত্ন করছে দেখে চাইশ্রার কেমন সন্দেহ হলো। একদিন রাজা যখন শিকারে বেরিয়েছে সেই সুযোগে চাইশ্রা ঘুঘু পাখিটিকে মেরে তার মাংস রান্না করলো। ফিরে এসে রাজা যখন জানলো তার ঘুঘু পাখিটির মাংস রান্না হয়েছে তখন সে খুব রাগ করলো। মাংস তরকারি না খেয়ে ঘরের পেছন দরজা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। কয়েকদিন পর সেই জায়গায় একটি কমলাগাছ জন্মালো। গাছটি দ্রুত বড় হয়ে উঠলো এবং একটি কমলা ধরল। রাজাকে স্বপ্নে এসে দেখা দিল শন্দ্রেম্বী; বলল—'ফলটি যখন পেকে যাবে তখন পেড়ে নিয়ে একটি হাঁড়ির ভেতর রেখে দিয়ো। এরকম পাঁচদিন থাকলে আমি আবার আগের রূপ পিরে পাবো।' রাজা কমলা গাছটির চতুর্দিকে বেড়া দিয়ে দিল যাতে কেউ কাছে ঘেঁষতে না পারে। এতে চাইশ্রার মনে সন্দেহ জাগে। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটনা আছে। তাই একদিন রাজার রাখাল যখন চাইশ্রার কাছে ফল খেতে চাইলো তখন চাইশ্রা পাকা কমলা ফলটি দেখিয়ে বললো, 'যাও, তুমি ওই ফলটি পেড়ে নিয়ে খেয়ে নাও।' রাখাল মনের আনন্দে ফলটি পেড়ে বাড়িতে নিয়ে গেল। হঠাৎ জরুরি এক কাজ পড়ায় সে ফলটি একটি হাঁড়ির ভেতর যত্ন করে রেখে কাজে চলে গেল। চারদিনের দিন ফিরে এসে ফলটি খাবে বলে হাতে নিয়ে ছুরি খুঁজতে গিয়ে দেখে ছুরি খুঁজে পাচ্ছে না। মন খারাপ করে আবার ফলটি রেখে দিল হাঁড়ির ভেতর।

এভাবে পাঁচদিন পূর্ণ হয়ে গেলে শন্দ্রেম্বী মানুষের রূপ নিয়ে বেরিয়ে এলো। রাজার রাখাল তো অবাক। শন্দ্রেম্বীর কাছে সবকিছু শুনে সে ছুটে গিয়ে রাজাকে খবরটা দিলো। খবর পেয়েই রাজা রাখালের বাড়ি ছুটে এসে শন্দ্রেম্বীকে মহাসমাদর করে বাদ্য-বাজনাসহ রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল। তারপর রাজা বদস্বভাবের মেয়ে চাইশ্রাকে দিলেন চরম শাস্তি আর শন্দ্রেম্বীকে ধুমধাম করে আবার রানির আসনে বসিয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিলেন বাকি জীবন।

CamScanner

লাই খূৎশাংবী

(লম্বা হাতওয়ালা পেতনি)

প্রাচীনকালে একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের পাশেই ছিল একটি ঘন বন। বনে নানা জাতের পশুপাখির সঙ্গে অনেক ভূত-পেতনি, অপদেবতারাও বাস করতো। তাদের মধ্যে ছিল একটি ভয়ংকর পেতনি–হাঁটার সময় যার লম্বা হাত মাটিতে গড়িয়ে যেতো। তার হাতের তালু ছিল খসখসে-কাঁটার মতো। চেহারাও ছিল ভীষণ আকৃতির। তাকে বলা হতো 'লাই খূৎশাংবী' বা 'লম্বা হাতওয়ালা পেতনি'। রাতের বেলা লাই খূৎশাংবী গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে ওত পেতে থাকতো, সুযোগ পেলেই দরজার ফাঁক দিয়ে লম্বা হাত ঢুকিয়ে টেনে নিয়ে আসতো ঘুমিয়ে থাকা শিশু-বাচ্চাদের। তারপর বনে নিয়ে গিয়ে আরাম করে খেতো। তার ভয়ে গ্রামবাসীদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যা হলেই তারা সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দিতো। তারপরও লাই খূৎশাংবীর ভয়ে তারা প্রায় রাতেই না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতো। গ্রামের প্রায় সব ঘরে সময়-সুযোগ করে হানা দিলেও লাই খূৎশাংবী কিন্তু একটি বাড়িতে কখনও যেতো না। গ্রামের এক প্রান্তে কিছুটা নিরিবিলিতে থাকা ওই বাড়িতে বাস করতো চাওবা নামের এক সাহসী মানুষ। স্ত্রী

আর একমাত্র শিশুকন্যা লৈরিককে নিয়ে তার সুখের সংসার। নাদুসনুদুস লৈরিকের প্রতি লাই খূৎশাংবীর খুব লোভ ছিল। কিন্তু চাওবার ভয়ে সে কোনোদিন ওই বাড়িমুখো হয়নি।

একদিন লাই খূৎশাংবী খবর পেলো যে, চাওবা ব্যবসার কাজে দূরের এক গ্রামে গেছে, রাতে ফিরবে না। তাই রাতে সাহস করে চাওবার বাড়িতে গেল সে। দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে ডাক দিলো—'ও লৈরিকের মা, জামাইবাবু কি বাড়িতে আছেন?'

লৈরিকের মা প্রমাদ গোনে। জানে, এটা লাই খূৎশাংবী ছাড়া আর কেউ নয়। এখন সত্যি কথা বললে সে দরজা ভেঙে লৈরিককে ধরে নিয়ে যাবে। তাই বুদ্ধি করে মিথ্যে বলে—'কেন গো, কী দরকার বলো? লৈরিকের বাবাতো শুয়ে আছেন, ডেকে দেবো নাকি?'

এ-কথা শুনেই লাই খূৎশাংবী 'না না, থাক তাহলে' বলে ভয়ে পালিয়ে যায়।

পরের দিন চাওবা ফিরে এলে লৈরিকের মা সমস্ত কিছু খুলে বলে। একবার যখন লাই খূৎশাংবী সাহস করে এসে গেছে তখন আবার আসবে। তাই তারা দু'জনে মিলে পরামর্শ করে। পরের রাতে লাই খূৎশাংবী আবার আসে। দরজায় খুব ধীরে ধীরে টোকা দিয়ে লাই খূৎশাংবী বলে, 'ও লৈরিকের মা, কী করছো? জামাইবাবু কি বাড়িতে আছেন?' লাই খূৎশাংবীর গলা শুনতেই চাওবা এক ধারালো লম্বা দা হাতে দরজার পাশে লুকিয়ে থাকে। তারপর লৈরিকের মা পরিকল্পনা অনুযায়ী মিথ্যে করে বলে, 'কেন গো, তিনি তো আজ বাড়িতে নেই। ব্যবসার কাজে বাইরে গেছেন। কী দরকার আমাকেই বলো।'

এ-কথা শুনে লাই খূৎশাংবী খুশি হয়ে বলে, 'তাহলে আজ আর রক্ষা নেই। তোমার লৈরিককে আমি ধরে খাবো।' এই বলে লাই খূৎশাংবী দরজার ফাঁক দিয়ে তার লম্বা হাত ঢুকিয়ে দেয়। আর আগে থেকে দা হাতে লুকিয়ে থাকা চাওবা এক কোপে কেটে ফেলে সেই হাত। প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে লাই খূৎশাংবী—

' অয়ো ইমা, মরে গেলাম রে
অয়ো য়ো ইমা, অয়ো য়ো,
লৈমা দেং দেং নিংজাউবি
লৈরিকের মা চিনথীবি (মিথ্যেবাদী),
অয়ো য়ো ইমা অয়ো য়ো।'

তারপর কাটা হাতটা টেনে নিয়ে চিৎকার করতে করতে বনের দিকে পালাতে থাকে লাই খূৎশাংবী। কাটা হাত বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে রক্তের ধারা। চাওবা-ও ছাড়ার পাত্র নয়। রক্তের দাগ দেখে পিছু নেয় সে। হাতকাটা পেতনি খুব জোরে দৌড়ুতে পারছিল না। কিছু দূর যেতে না যেতেই বার বার পড়ে

যাচ্ছিল। চাওবা তাকে ধরে ফেলে আর দা'এর আরেক কোপে কেটে ফেলে অন্য হাতটিও। কিন্তু প্রাণে মারে না লাই খূৎশাংবীকে। পড়িমরি করে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে যায় হাতকাটা পেতনিটি।

সেই দিনের পর আর লাই খূৎশাংবী কখনও গ্রামের সীমানায় আসে না। চাওবার সাহসিকতায় ধন্য ধন্য করে গ্রামবাসী। তার পর থেকে চাওবার পরিবার এবং গ্রামবাসী সবাই সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে।

CamScanner

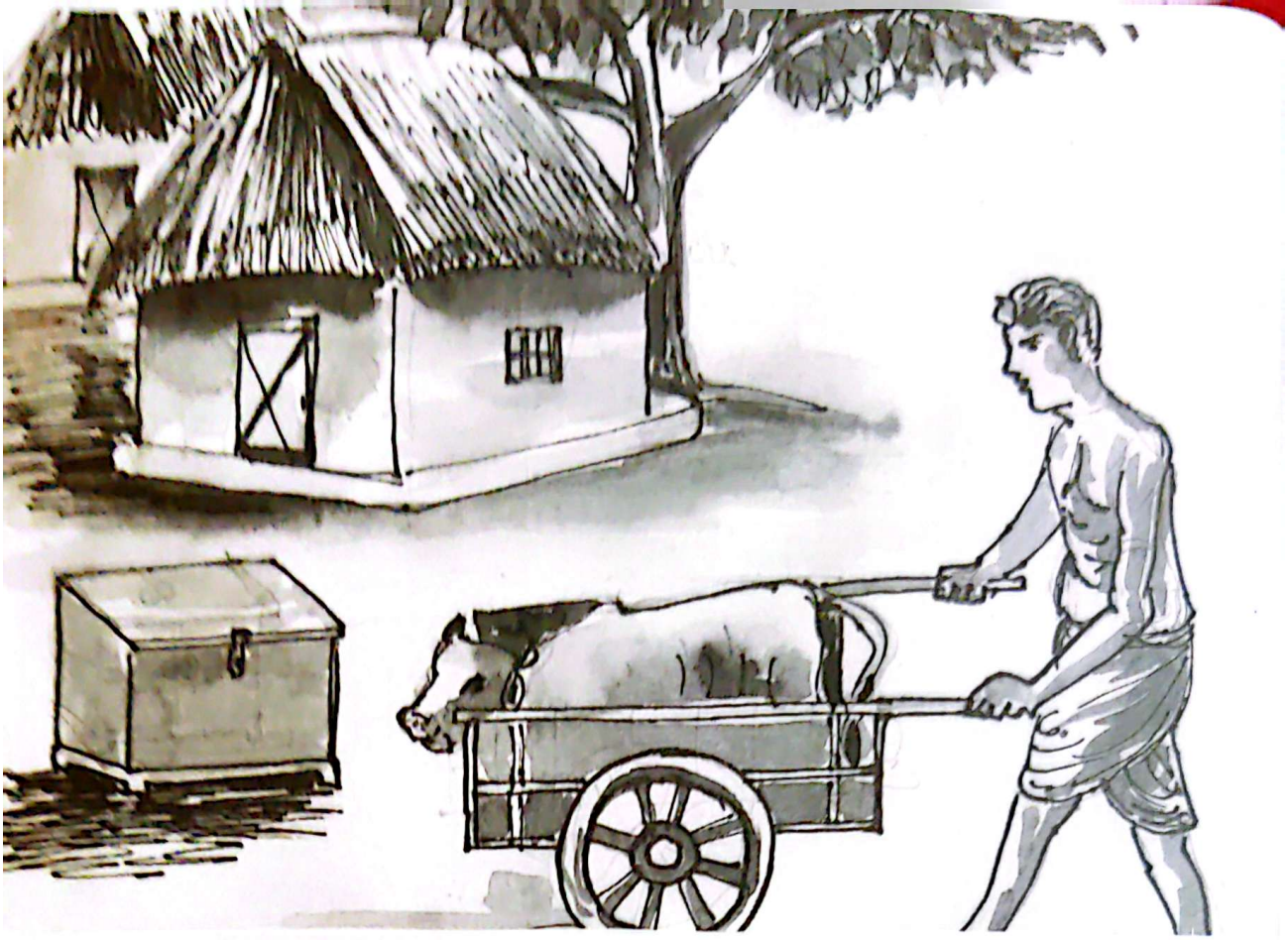

পি-থাদোই

সে অনেকদিন আগের কথা। এক গ্রামে পি-থাদোই নামে এক লোক বাস করতো। সে ছিল খুবই চতুর। কেউ তাকে ঠকাতে পারতো না। বরং সে নানাভাবে লোক ঠকিয়ে নিজের আখের গোছাতো। এ-নিয়ে তার নিজের মধ্যে একটা অহংকারবোধও ছিল। আর এজন্য গ্রামের লোকেরা তাকে তেমন পছন্দও করতো না।

একদিন পি-থাদোই যখন মাঠে হাল বাইছিল তখন গ্রামের কিছু দুষ্ট লোক তাকে লক্ষ করে ঢিল ছোঁড়ে। কিন্তু তার ভাগ্য ভালো, ঢিলটা তার গায়ে লাগেনি। তবে সেই ঢিলের আঘাতে তার একটি হালের বলদ মরে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে দুষ্ট লোকেরা পালিয়ে যায়। হালের বলদ মরে যাওয়ায় পি-থাদোই-এর মন খুব খারাপ হয়ে যায়। দুষ্ট গ্রামবাসীদের ওপর রেগে যায় সে। কিন্তু সে জানে, তাদের সঙ্গে সে একা পেরে উঠবে না। তাই মাথা ঠান্ডা করে ভাবে, গায়ের জোরে নয়, কৌশলে এর প্রতিশোধ নিতে হবে। রাতে একটি ঠেলাগাড়িতে মৃত গরুটিকে তুলে সে নিজে ঠেলতে ঠেলতে চলে গেলো পাশের 'কাবুই'দের (কাবুই–একটি পাহাড়ি জনগোষ্ঠী) গ্রামে। সেখানে একজন সচ্ছল কাবুই গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে ঠেলাগাড়ি দাঁড় করিয়ে যেই তাকে ডাকতে গেছে, তখনই পি-থাদোই দেখলো একটি লোক দৌড়ে গিয়ে বারান্দায় রাখা একটি কাঠের খালি সিন্দুকে ঢুকে

CamScanner

লুকিয়ে পড়েছে। পি-থাদোই বুঝতে পারলো লুকিয়ে পড়া ওই লোকটি আসলেই একজন চোর। সে খুব আস্তে গিয়ে সিন্দুকের পাল্লা লাগিয়ে খিল আটকে দিল। তারপর গৃহস্থকে ডাকতে শুরু করলো। 'খুড়ো, বলি ও খুড়ো, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?'

'কে, এতো রাতে বাইরে থেকে ডাকাডাকি করছো কেন?' ভেতর থেকে গম্ভীর গলা ভেসে আসে প্রবীণ গৃহস্থের।

পি-থাদোই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'খুড়ো, আমি ওই পাশের গ্রামের পি-থাদোই। চিনতে পারছো কি?'

'হ্যাঁ, সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু এতো রাতে কী চাই তোমার?'

'এতো রাতে তোমাকে বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত আমি খুড়ো। কিন্তু কী করবো বলো, আমার কাজটা যে খুব জরুরি। আমি একটি স্বাস্থ্যবান বলদ গরু নিয়ে এসেছি বিক্রি করার জন্য। এর বিনিময়ে তুমি আমাকে যা খুশি দিয়ো। কিন্তু এখন আমার কিছু টাকা পাওয়া খুব জরুরি। তাই বাধ্য হয়ে গরুটা বিক্রি করতে এসেছি খুড়ো।'

গৃহস্থ বুড়ো বিরক্ত হয়। বলে, 'এতো রাতে আমি আর উঠতে পারবো না। কাল সকালে এসো।'

কিন্তু পি-থাদোই নাছোড়বান্দা। সে বলে, 'খুড়ো, আমি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না। আমার যে বিষয়টা খুব জরুরি। এক কাজ করো, তোমার কষ্ট করে ওঠা লাগবে না। আমি বরং বলদ গরুটাকে তোমার গোয়ালে বেঁধে রেখে যাই। আর তুমি অনুমতি দিলে তার মূল্য বাবদ তোমার বারান্দায় রাখা খালি কাঠের সিন্দুকটা নিয়ে যেতে চাই।'

গৃহস্থ কাবুই বুড়ো খুশি হয়। একটি স্বাস্থ্যবান বলদের পরিবর্তে একটি খালি কাঠের সিন্দুক। তাই খুশি হয়ে সে বলে, 'ঠিক আছে ঠিক আছে পি-থাদোই, তোমার যদি তাতে পোষায় তাহলে তাই করো।'

পি-থাদোই খুশি হয়ে মরা গরুটিকে ঠেলাগাড়ি থেকে নামিয়ে গোয়ালঘরে শুইয়ে দিয়ে কাঠের সিন্দুকটি ঠেলাগাড়িতে তুলে ঠেলতে ঠেলতে চলে আসে।

সিন্দুকের ভেতরে বসা চোরটি মনে মনে প্রমাদ গোনে। সে খুব আস্তে করে বলে, 'ভাই পি-থাদোই, দয়া করে তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে অনেক সোনা-রূপা দেবো।'

পি-থাদোই মনে মনে খুশি হয়। বলে, 'ঠিক আছে, তোমাকে ছেড়ে দেবো। কিন্তু তুমি এই তল্লাট ছেড়ে একেবারে চলে যাবে। আর কখনও যেন তোমাকে এদিকে না দেখি।' এই বলে সে সিন্দুকের ডালা খুলে চোরকে মুক্ত করে দেয়। আর চোরের কাছে থাকা সমস্ত সোনা-রূপা রেখে দেয়। চোর বেচারাও মুক্তি পেয়ে

CamScanner

ছুটে চলে যায়। অনেক ধন-সম্পত্তির মালিক হয়ে পি-থাদোই মনের আনন্দে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে থাকে। বেশ কিছুদিন ঘুরে বেড়িয়ে একজন সুন্দরী যুবতীকে বিয়ে করে ফিরে এলো নিজ গ্রামে। পি-থাদোই-এর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয় গ্রামবাসী। তারা বুঝতে পারে না, কী করে পি-থাদোই এতো ধন-সম্পদের মালিক হয়ে গেলো। তার প্রতি তাদের ঘৃণা ও হিংসা আরও বেড়ে যায়। হিংসুটে গ্রামবাসীরা পি-থাদোইকে যে কোনো মূল্যে হত্যা করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। এই ভেবে তারা একদিন রাতে পি-থাদোই ও তার সুন্দরী স্ত্রী যখন একসঙ্গে বসে রাতের খাবার খাচ্ছে তখন দরজার বাইরে থেকে ঢিল ছোঁড়ে। কিন্তু, পি-থাদোই নয়, ঢিলের আঘাতে আহত হয় তার স্ত্রী এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সে মারা যায়। ভয় পেয়ে দুষ্ট গ্রামবাসী পালিয়ে যায়।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে যায় পি-থাদোই। সে তার স্ত্রীকে খুবই ভালোবাসতো। ফলে, স্ত্রীর এই আকস্মিক মৃত্যুতে যেমন সে খুব দুঃখিত হয়, তেমনি দুষ্ট গ্রামবাসীদের উপরও ক্রুদ্ধ হয় পি-থাদোই। কিন্তু সে হারবার পাত্র নয়। তাই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একটা নতুন ফন্দি বের করে। মৃত বৌকে নিয়ে গিয়ে পুকুরপারে রাস্তার পাশের একটি আমগাছের ছায়ায় বসিয়ে রাখে। তারপর তার সামনে কিছু তাজা ফলমূল সাজিয়ে রাখে, যেন দেখে মনে হয় বউটি ফলমূল বিক্রির জন্য পসরা সাজিয়ে বসেছে। আর সে নিজে আমগাছের পেছনে লুকিয়ে থাকে। ভোর হতে না হতেই একজন ধনী শেঠ তার অনুচরবৃন্দ নিয়ে পালকিতে চড়ে সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো। শেঠ যখন দেখলেন এই ভোরেই একজন সুন্দরী রমণী গাছের তলে বসে ফলমূল বিক্রি করছে, তখন তিনি তার অনুচরদের কিছু ফলমূল কিনে আনতে বললেন। একজন অনুচর মহিলার কাছে গিয়ে বার বার ডাকাডাকি করেও কোনো জবাব না পাওয়ায় শেঠ নিজে গিয়ে মহিলাটিকে ডাকতে শুরু করলেন। কিন্তু তার কথারও কোনো জবাব এলো না। শেঠ একটু অবাক হয়ে হাত দিয়ে মহিলার গায়ে একটু ধাক্কা দিতেই মহিলাটি গড়িয়ে পড়ে গেলো পুকুরের জলে। সুযোগের অপেক্ষায় লুকিয়ে থাকা পি-থাদোই আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার জুড়ে দিল—'কে কোথায় আছো রে ভাই, ওই লোকটি আমার স্ত্রীকে পানিতে ফেলে মেরে ফেলল রে। আমার স্ত্রী সাঁতার জানে না, তাকে পানিতে ফেলে দিল ওই লোকটি। তোমরা কে কোথায় আছো রে ভাই, জলদি এসো।'

পি-থাদোই-এর চেঁচামেচি শুনে ঘাবড়ে গেল শেঠ। ভাবল, গ্রামবাসী জেগে উঠলে তো একটা বড় বিপদ হয়ে যাবে। তাই সে তাড়াতাড়ি পি-থাদোই-এর হাত ধরে অনুনয় বিনয় করে বলল, 'ভাই, আমিতো ইচ্ছে করে কিছু করিনি। ডাক শুনছে না দেখে হাত দিয়ে একটু ছুঁয়েছিলাম, তাতেই তো এই দুর্ঘটনা। যা হবার

তো হয়ে গেছে। আমি তো আর তোমার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবো না, তবে ক্ষতিপূরণ হিসেবে এই সামান্য কিছু তোমাকে দিচ্ছি। এই নিয়ে আর তুমি হৈ-চৈ করো না ভাই।' এই বলে শেঠ পি-থাদোইকে এক থলে ভর্তি সোনা মণিমুক্তা দিল। 'ঠিক আছে, কী আর করা' বলে পি-থাদোই সোনা মণিমুক্তার থলে নিয়ে বাড়িতে ফিরে গেল।

পি-থাদোই আরও ধনী হয়ে উঠল। তার অবস্থার আরও উন্নতি দেখে হিংসুটে গ্রামবাসীর আর চোখে ঘুম নেই। তারা ভেবে পায় না, 'আমরা লোকটার ক্ষতি করার জন্য এতো কিছু করি কিন্তু তাতে তার অবস্থার আরও উন্নতি হয়। এটা কীভাবে সম্ভব?' এবার তারা ঠিক করে আর লুকিয়ে কিছু করা নয়, সরাসরি আক্রমণ করে তাকে প্রাণে মেরে ফেলতে হবে। এই ভেবে তারা একদিন দলবল নিয়ে পি-থাদোই-এর বাড়িতে ঢুকে তাকে বন্দি করে এবং হাত-পা বেঁধে একটি ছালার ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। তারপর ছালার মুখ বেঁধে তারা তাকে কাঁধে করে হাঁটতে থাকে দূরে জনমানবহীন কোথাও কোনো জলাভূমিতে ফেলে দেবে বলে। হাঁটতে হাঁটতে রাত ভোর হয়। পি-থাদোই-এর মতো একজন শক্ত সমর্থ মানুষকে কাঁধে করে হাঁটতে হাঁটতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একটি গাছের তলায় মুখবন্ধ বস্তাটি নামিয়ে রেখে তারা সবাই কাছেই বিশ্রাম নিতে থাকে। পথের ক্লান্তিতে তারা নিমেষেই ঘুমিয়ে পড়ে। সেই রাস্তা দিয়ে তখন এক রাখাল তার গরুর পাল নিয়ে যাচ্ছিলো। সে হঠাৎ শুনলো বস্তার ভেতর থেকে কে যেন চাপা গলায় বলছে, 'আমি মন্ত্রী হতে চাই না। না না আমি মন্ত্রী হবো না। আমাকে ছেড়ে দিন।'

রাখালটি অবাক হয়ে একটু কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কে ভাই আপনি? বিড়বিড় করে কী বলছেন?'

পি-থাদোই তখন বললো, 'ভাই, রাজার লোকেরা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দেশের মন্ত্রী বানাবে বলে। কিন্তু আমি তো মন্ত্রী হতে চাই না। তাই তাদেরকে বার বার অনুনয়-বিনয় করে বলছি আমাকে ছেড়ে দিতে।'

'এ কী বলছেন আপনি?' বিস্মিত রাখালের প্রশ্ন। 'আপনাকে মন্ত্রী বানাতে চায় তারা, আর আপনি রাজি হচ্ছেন না। কেমন বোকা আপনি। আমাকে বললে তো আমি এক কথায় রাজি হয়ে যেতাম।'

'ঠিক আছে, তাহলে তুমিই মন্ত্রী হয়ে যাও' পি-থাদোই বললো, 'বস্তার মুখ খুলে আমাকে মুক্ত করে দাও আর তুমি এর ভেতরে ঢুকে পড়ো। তারা যখন এসে তোমাকে কাঁধে তুলবে তুমি বলে দিয়ো যে তুমি মন্ত্রী হতে রাজি আছো। তাহলে তুমিই মন্ত্রী হয়ে যাবে।' যেই কথা সেই কাজ। পি-থাদোই মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এলো আর লোভী রাখালকে বস্তার ভেতর ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হলো। তারপর পি-থাদোই মনের আনন্দে রাখালের গরুর পাল নিয়ে বাড়ির পথ ধরলো।

CamScanner

গ্রামের দুষ্ট লোকগুলোর ঘুম ভেঙে গেলে তারা এসে বস্তা তুলে নিলো কাঁধে। তখনই ভেতরে থাকা রাখাল চিৎকার করে বলে উঠলো, 'শোনো ভাইয়েরা, আমি মন্ত্রী হতে চাই। আমাকে মন্ত্রী বানাও।' এ-কথা শুনে তারা ভাবলো বস্তার ভেতর বন্দি থাকতে থাকতে নিশ্চয়ই পি-থাদোই-এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই সে প্রলাপ বকছে। তারা তাই তাড়াতাড়ি মুখবন্ধ বস্তাটিকে নদীর জলে ফেলে দিল। তারপর পি-থাদোই মরে গেছে ভেবে তারা খুশি মনে গ্রামে ফিরে এলো। কিন্তু গ্রামে ফিরেই তারা যখন দেখলো পি-থাদোই নিজের বাড়িতে সুখেই আছে, দুধেল গাইসহ অনেক গরুতে ভরে আছে তার গোয়ালঘর; তখন তারা শুধু অবাক হলো না, ভয়ও পেলো। তারা ভাবলো পি-থাদোই-এর নিশ্চয়ই কোনো অলৌকিক শক্তি আছে। না-হলে যাকে তারা এইমাত্র বস্তাবন্দি করে নদীতে ফেলে এলো, সে কি-না তাদের আগেই গ্রামে নিজ বাড়িতে ফিরে এসেছে। শুধু তা-ই নয়, তার ধনসম্পদও বেড়ে গেছে আগের চেয়ে। তারা শত্রুতার কথা ভুলে গিয়ে পি-থাদোই-এর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইলো। ধীরে ধীরে কাছে এসে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা পি-থাদোই, তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। আমাদের ভুল হয়ে গেছে। আমরা আর তোমার কোনো ক্ষতি করতে যাবো না। কিন্তু একটি কথা জানতে চাই, তোমাকে তো আমরা বস্তাবন্দি করে নদীতে ফেলে এলাম। সেখান থেকে তুমি কী করে এখানে এলে, সেকথা কি একটু বলবে?'

পি-থাদোই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললো, 'ভাইয়েরা, তোমাদের উপর আমার কোনো রাগ নেই। বরং তোমরা যে আমাকে বস্তাবন্দি করে নদীতে ফেলে দিয়েছিলে সেজন্য তোমাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি তো সোজা মৃত্যুপুরিতে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখা হলো আমার বাবা-মা, দাদু-দিদাসহ অনেকের সঙ্গে। তারা আমাকে দেখে আহ্লাদে আটখানা। আমাকে আদর করে খাওয়ালো, আরও কতো কিছু উপহার দিলো। তোমাদের অনেকের গুরুজনদের সঙ্গেও দেখা হয়েছে সেখানে। তারা তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করেছে। বলেছে, একবার যদি তোমাদের সঙ্গেও দেখা হতো তাহলে তাদের কতো ভালো লাগতো।'

পি-থাদোই-এর এ-কথা শুনে দুষ্ট গ্রামবাসীরা লোভী হয়ে উঠলো। তারা ভাবলো তারাও যদি একবার পি-থাদোই-এর মতো মৃত্যুপুরিতে যেতে পারতো তাহলে তাদের পিতা-মাতাদের সঙ্গে দেখা হতো, তারা কতো আদর করতো, উপহার দিতো। এই ভেবে তারা বললো, 'পি-থাদোই, আমরাও একবার মৃত্যুপুরিতে যেতে চাই। কীভাবে যেতে পারবো তুমি একটু বলে দাও না।'

তাদের কথা শুনে পি-থাদোই একটু গম্ভীর হয়ে বললো, 'হ্যাঁ, যেতে পারবে।

CamScanner

তোমরা যদি কোনো ধরনের কুমতলব না করে সরল মনে যেতে চাও, তাহলে সম্ভব। আমি যে পথে গেছি সে পথেই যেতে হবে। তোমাদেরকেও যদি বস্তাবন্দি করে নদীর ঠিক ওই জায়গাতেই ফেলে দেওয়া হয় তাহলে সোজা একেবারে মৃত্যুপুরিতে গিয়ে পৌঁছবে। তবে দেখো, কেউ যেন না জানে, বিষয়টা গোপন থাকতে হবে।' গ্রামবাসী সবাই রাজি হয়ে গেলো। পরদিন খুব ভোরে সকলেই নিজ-নিজ ছালা-রশি নিয়ে নদীর পারে এসে উপস্থিত। পি-থাদোই বার বার করে সকলকে বলে দিল, 'দেখো, সেখানে আরাম-আয়েশে থেকে আবার বাড়ির কথা ভুলে যেয়ো না। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, নাহলে বাড়িতে সবাই চিন্তা করবে।' মৃত্যুপুরিতে যাওয়ার আনন্দে মশগুল গ্রামবাসী হইচই করে উঠলো, 'না না, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, আমার তো আবার ধান রোয়ার কাজ বাকি; আজ-কালের মধ্যেই তা শেষ করতে হবে।'

তখন পি-থাদোই তাদের সবাইকে এক-এক করে ছালার ভেতর ঢুকিয়ে রশি দিয়ে ভালো করে বেঁধে দিল। তারপর এক-এক করে নদীতে ফেলে দিল। দুষ্ট গ্রামবাসী তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করল আর পি-থাদোইও শত্রুমুক্ত হয়ে মনের আনন্দে বাকি জীবন সুখে-শান্তিতে কাটিয়ে দিল।

CamScanner

ইতা থাওমৈ

(প্রিয় সই কুপি বাতি)

সেই প্রাচীনকালে থাবল্লে নামের এক বৃদ্ধ মহিলা গ্রামের এক প্রান্তে একটি বাড়িতে একা বসবাস করতো। তার স্বামী মারা গেছে অনেকদিন আগে। পুত্র-কন্যাও কেউ নেই। তাই তার ছিল একাকীত্বের এক কষ্টকর জীবন। তবে সেই বৃদ্ধা ছিল খুবই কর্মঠ। সারাদিন কোনো না-কোনো কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতো। দিনের বেলা সে তার নিজের তাঁতে নিজেই কাপড় বয়ন করতো। আর রাতের বেলা বসে বসে চরকায় সুতা কাটতো। এভাবে কাপড় বয়ন করে সে বেশ টাকাপয়সা রোজগার করতো। এক সচ্ছল মহিলা হিসেবে সারা গ্রামে তার একটি বিশেষ পরিচিতিও ছিল। ফলে, তার ধনসম্পদের প্রতি অনেকের ছিল এক ধরনের লোভী দৃষ্টি; বিশেষ করে চোরদের।

এক রাতে থাবল্লে যখন পেছনের দরজা খুলে বাইরে ময়লা ফেলতে যাচ্ছিল তখনই আগে থেকে ওত পেতে থাকা একটি চোর চুপিসারে ঢুকে পড়ে ঘরের ভেতর। তারপর সুযোগের অপেক্ষায় ঘরের ভেতর জ্বলতে থাকা একমাত্র কুপি বাতিটির টিমটিমে আলো পৌঁছতে পারে না এমন এক অন্ধকার ছায়ায় লুকিয়ে থাকে। থাবল্লে রাতের রান্না শেষ করে খাওয়াদাওয়া সেরে অন্যান্য দিনের মতো চরকা নিয়ে সুতা কাটতে বসে। তখনই সে বাতির পেছনে অন্ধকারে বসে থাকা

চোরটিকে দেখে। ভয়ে আতঙ্কে সে এতোটাই হকচকিয়ে যায় যে সে না পারে চিৎকার করতে না পারে চুপচাপ বসে থাকতে। কিন্তু থাবল্লে ছিল খুবই বুদ্ধিমতী। সে জানে এখন 'চোর চোর' বলে চিৎকার দিতে গেলে চোরটি পালিয়ে তো যাবেই, এমনকী তাকে একা পেয়ে আক্রমণ করে বসতেও পারে। তাই সে মাথা ঠান্ডা করে কিছু হয়নি এমন ভাব করে চুপচাপ কাজ করে যেতে থাকে। আর মনে মনে ভাবতে থাকে কী করা যায় এখন। অনেক ভেবে একটি কৌশল বের করে সে।

থাবল্লে তার সামনে রাখা কুপি বাতিটির দিকে তাকিয়ে খুব দরদ দিয়ে ডাকে, 'ইতা থাওমৈ, ইতা থাওমৈ (প্রিয় সই কুপি বাতি)'। কিন্তু প্রাণহীন বাতি কোনো জবাব দেয় না। কয়েকবার ডাকার পরও যখন কোনো জবাব আসে না, তখন থাবল্লে দুঃখিত গলায় বলে, 'কী হলো সই, আজ কোনো কথা বলছো না কেন? আমার ডাকেরও কোনো জবাব দিচ্ছো না আজ। কী হলো তোমার?'

বৃদ্ধ মহিলাটির কথা শুনে আতঙ্কিত বোধ করে চোরটি। ভাবে, অন্যান্য দিন হয়তো কুপি বাতিটি মহিলাটির সঙ্গে কথা বলতো। আজ সে লুকিয়ে আছে জেনে বোধ হয় বাতিটি কথা বলছে না। তাহলে তো মহিলাটি তার উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে। তাই অপেক্ষায় থাকে এবার মহিলাটি ডাক দিলেই সে নিজে কুপি বাতি সেজে জবাব দেবে। আর তখনই থাবল্লে আবার ডাকে, 'ও ইতা থাওমৈ'। লুকিয়ে থাকা চোরটি একটু চাপা গলায় তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়—'হাও' (কারও ডাকে জবাব দেওয়া)।

থাবল্লে বুঝতে পারে তার কৌশল কাজ করছে। সে তখন প্রিয় মানুষের সঙ্গে যেভাবে কথা বলে লোক সেরকমভাবে খুব অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বলে, 'শোনো ইতা (সই), আজ তোমাকে একটি গল্প বলবো। এক দেশে এক বিধবা ছিল। তার কেউ ছিল না। একটি বাড়িতে একা থাকতো। একদিন রাতে ওই বাড়িতে চোর ঢুকলো। মহিলাটি চোরকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলো 'চোর চোর' বলে।' এভাবে মহিলাটি তার ইতাকে (সই) গল্প বলে যাচ্ছে আর গল্প বলার ছলে 'চোর চোর' বলে জোরে চিৎকার দিচ্ছে। চোরটি অন্ধকারে বসে মহিলাটির গল্প শুনছে মন দিয়ে। আর মহিলাটি বলে যাচ্ছে তার গল্প। এদিকে মহিলাটির 'চোর চোর' চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে চোরটিকে ধরে ফেলে।

থাবল্লের কৌশল ও বুদ্ধির কারণে কোনোরকম বিপদ ছাড়াই চোরটি ধরা পড়ে এবং গ্রামবাসীও এর পর থেকে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে।

CamScanner

বানরের পিঠাভাগ

হওয়াইমান নামের এক বুড়ি বাস করতো এক গ্রামে। তার কোনো সন্তানসন্ততি বা পরিবার পরিজন ছিল না। একা বসবাস করতো সে। কিন্তু তার একার সংসারে ছিল দু'টি পোষা বিড়াল—থোইবা ও থাম্বালনু। বিড়াল দু'টিকে হওয়াইমান তার সন্তানের মতো করে ভালোবাসতো। প্রতিদিনই নিজে খাওয়ার আগে পোষা বিড়াল দু'টিকে খাওয়াতো। বিড়াল দু'টিও অপেক্ষায় থাকতো কখন তাদের মনিব বাড়িতে ফিরে আসবে। আর বুড়ি ফিরে এলেই বিড়াল দুটি তার চারপাশে ঘুরঘুর করতো কিছু খাওয়ার আশায়।

এক দিন হওয়াইমান পোষা বিড়াল দু'টির জন্য এক টুকরো রুটি নিয়ে এলো। বিড়াল দুটোও বারান্দায় বসে তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। বুড়িকে দেখেই তারা ছুটে এসে আনন্দে 'মিউ' 'মিউ' করতে করতে তার দু'পায়ে মুখ ঘষতে থাকে। বুড়িও তাদের মাথায় শরীরে হাত বুলিয়ে দিয়ে আদর করে। তারপর ব্যাগ থেকে তাদের জন্য আনা রুটি বের করে সমান দুই ভাগে ভাগ করতে যেই বসেছে অমনি থোইবা ঝাঁপিয়ে পড়ে রুটি মুখে নিয়েই চম্পট। বুড়ি 'কী করছো' 'কী করছো' বলে হইচই করে উঠলো। থাম্বালনুও 'মিঁয়াউ মিঁয়াউ' করে চিৎকার করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়লো থোইবার উপর—'এতো লোভী কেন তুমি? ওটাতো আমাদের

CamScanner

মনিব দু'জনকে সমান ভাগ করে খেতে বলেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ তাই। আমিও তো সেজন্য রুটিটি নিয়ে এসেছি। তুমি এতো অস্থির হচ্ছো কেন?' একটু ঝাঁঝ মেশানো গলায় জবাব দেয় থোইবা। 'এসো আমরা দু'জনে এখানে বসে রুটিটি ভাগ করে নিই।' এই বলে থোইবা রুটি হাতে নিয়ে যেই দুই ভাগ করতে যাবে অমনি থাম্বালনু বলে উঠলো,'না না, তুমি না, আমাকে দাও আমি ভাগ করবো।' কিন্তু থোইবা তাতে রাজি না। ফলে, ঝগড়া বেঁধে গেলো দু'জনের। অনেক ঝগড়া হলো, কিন্তু কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি না। অবশেষে থাম্বালনু বললো, 'দেখো, দু'জনে ঝগড়া করে লাভ কী? তার চেয়ে বরং এসো আমরা এমন একজনকে খুঁজে বের করি, যে আমাদের মধ্যে রুটিটি সমানভাগে ভাগ করে দেবে।' থোইবা রাজি হলো এই প্রস্তাবে।

দু'জনে মিলে অনেক খোঁজাখুঁজি করে পেলো বানর-সর্দারকে। সে বসেছিল কাছের একটি গাছের মগডালে। সে ছিল প্রবীণ ও জ্ঞানী। থোইবা ও থাম্বালনু তাকে লক্ষ করে বললো, 'হে প্রবীণ বানর, তুমি কি আমাদের একটি কাজ করে দেবে? আমাদের কাছে একটি রুটি আছে, এটাকে কি তুমি আমাদের দুজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেবে? তোমার জ্ঞান এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে। সেকারণেই আমরা তোমার কাছে এসেছি।'

গাছের উপর থেকে ধীরে ধীরে নেমে এলো বানর-সর্দার। 'ঠিক আছে, আমি তোমাদের মধ্যে রুটিটি ঠিক সমানভাগে ভাগ করে দেবো।।' এই বলে সে একটি দাঁড়িপাল্লা বের করলো। তারপর রুটিকে এমনভাবে দুভাগ করলো যাতে একভাগ একটু বেশি হয়। রুটির দুই টুকরো পাল্লার দুই দিকে দিয়ে দেখা গেল এক দিক ভারী হয়ে গেছে। 'ও, এই দিকেরটা একটু বড় হয়ে গেছে' বলে রুটির টুকরোটি থেকে বেশ বড় এক অংশ ছিঁড়ে মুখে পুড়ে দিল। থোইবা ও থাম্বালনু অবাক হয়ে কেবল তাকিয়ে থাকলো, কিছুই বলতে পারলো না। তারপর আবার ওজন করে দেখা গেল পাল্লার ওই দিক ভারী হয়ে গেছে। তখন আবার ভারী দিক থেকে এক টুকরো রুটি এমনভাবে ছিঁড়ে খেয়ে নিল যে, ওই দিকের রুটির টুকরো অপর দিক থেকে ছোট হয়ে যায়। এখন মাপতে গিয়ে দেখা গেল, অন্য দিক ভারী হয়ে গেছে। বানরটি আবার ভারী দিক থেকে রুটি ছিঁড়ে খেয়ে নিল। এভাবে বানরের রুটি ভাগের কাজ চলতে থাকে। এক পর্যায়ে পাল্লার দুই দিকের রুটির দুই টুকরোর ওজন সমান দেখা গেল। ততক্ষণে বানর-সর্দার রুটি ভাগের নামে রুটির অধিকাংশই খেয়ে ফেলেছে। এখন কেবল পাল্লার দুই দিকে পড়ে আছে ছোট ছোট দুই টুকরো রুটি। বিড়াল দু'টি বানরের এই চালাকিতে খুব কষ্ট পেলো। একজন নিজেকে সামলাতে না পেরে একটু কর্কশ গলায় বলে উঠলো, 'এ কী হলো বানর-সর্দার? এটা কি ঠিক হলো? রুটি ভাগ কি এভাবে করা হয়?'

CamScanner

বানর-সর্দার খুব ধীর গলায় বললো, 'দেখো বাছারা, একেবারে সমানভাবে ভাগ করা কিন্তু চাট্টিখানি কথা নয়। আমি তো শেষ পর্যন্ত তোমাদের এই রুটি একেবারে সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছি, তাই না? কিন্তু এই যে এতো কষ্ট করলাম, তা আমার পারিশ্রমিক কোথায়?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা দু'টি বিড়ালের দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে বানর-সর্দারটি বলে উঠলো, 'ঠিক আছে, পারিশ্রমিক হিসেবে তোমাদের যখন দেওয়ার মতো কিছু নেই, আমি এই ছোট দুই টুকরো রুটিই আমার পারিশ্রমিক হিসেবে নিয়ে নিলাম।' এই বলে বানরটি বাকি দুই টুকরো রুটি মুখে পুড়ে লাফ দিয়ে উঠে গেলো গাছে।

নিজেদের বোকামির জন্য নিজেরাই নিজেদের চুল ছিঁড়তে থাকলো থোইবা ও থাম্বালনু। তারা বুঝলো, এভাবে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করা মোটেও ঠিক নয় এবং প্রতিজ্ঞা করলো এরকম ভুল আর তারা কখনও করবে না।

CamScanner

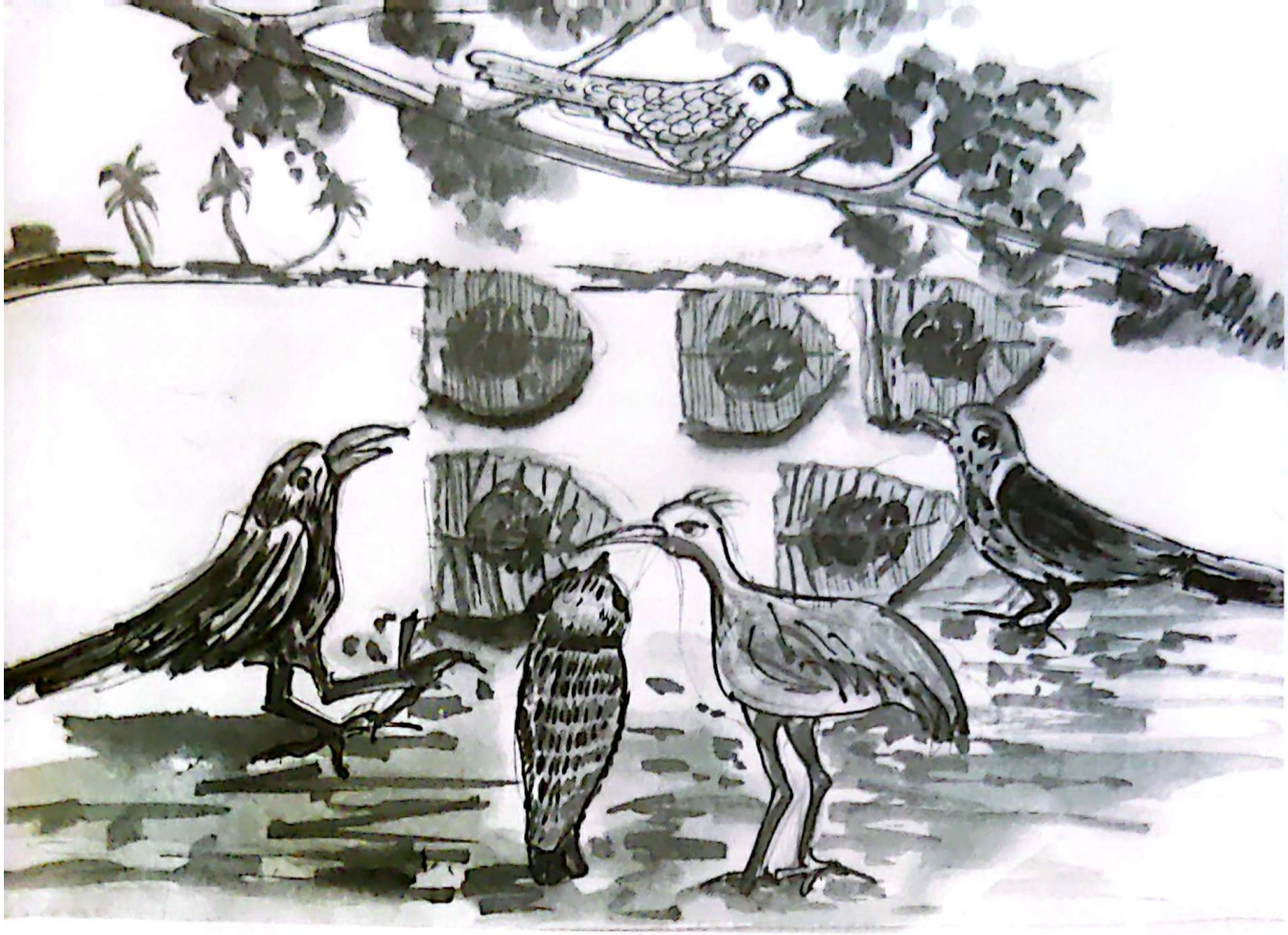

ঘুঘুর ভূরিভোজ

এক বনে এক জোড়া ঘুঘু বাস করতো। একদিন তারা দাঁড়কাক, সারস, চিল ও প্যাঁচাকে দুপুরের খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানালো। ঘুঘু দম্পতির আমন্ত্রণ পেয়ে তারা সবাই খুব খুশি। দাঁড়কাক তার কালো শক্ত ঠোঁটটাকে ঘষে ঘষে আরও মসৃণ করতে থাকে, সারস তার শরীর থেকে পুরোনো লোম বেছে বেছে নিজেকে আরও সুন্দর করে তোলে, চিল তার তীক্ষ্ণ ঠোঁট ও নখ আরও তীক্ষ্ণ করে আর প্যাঁচা তার শিকারি নখরকে আরও ধারালো করে।

নির্দিষ্ট দিনে আমন্ত্রিত চার অতিথিই যথাসময়ে ঘুঘুর বাড়িতে এসে পৌঁছে। ঘুঘু দম্পতি অতিথিদের জন্য সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করে এবং যথারীতি তারা অতিথিদের জন্য খাবার পরিবেশন করে। খাবারগুলো থেকে খুব সুন্দর ঘ্রাণ ভেসে আসছিল আর অতিথিরাও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে। এসময় পুরুষ ঘুঘুটি সবার সামনে এসে দু'টি পাখাকে একত্র করে হাত জোড় করার ভঙ্গিতে সবাইকে প্রণাম জানিয়ে বলে— 'আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমার এই সামান্য আয়োজনে উপস্থিত হওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি আজকের এই ভোজসভার আয়োজন করেছি আমার প্রয়াত পিতার শেষ ইচ্ছে পূরণের জন্য। তিনি তার মৃত্যুশয্যায় আমাকে শেষ উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে,

CamScanner

আপনাদের চারজন নাকি আমার বাবাকে এবং আমাদের সকলকে বিপদে আপদে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তিনি জীবৎকালে তার কোনো প্রতিদান দিয়ে যেতে পারেননি। তাই তিনি আমাকে বলেছেন, আমি যেন সবসময় আপনাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করি এবং সময় সুযোগ করে একবার যেন আপনাদেরকে নিমন্ত্রণ করে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করি ও আপনাদের আশীর্বাদ নিই। বাবার সেই অন্তিম নির্দেশ পালনের জন্যই আমার আজকের এই আয়োজন। আমার বাবা আরেকটি কথা বলে গেছেন, আমাদের জাতির ঐতিহ্য অনুযায়ী আপনাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁকে যেন প্রথম আসনে বসাই এবং তাঁর কাছ থেকে যেন আমাদের বংশের সম্মান ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। সুতরাং আসুন, সবাই বয়সের ক্রম অনুযায়ী একে একে আসন গ্রহণ করুন। আমি এবং আমার স্ত্রী আপনাদের পরিবেশন করবো। দয়া করে আমার পিতার শেষ ইচ্ছা পূরণে আমাদেরকে সহায়তা করুন।'

পুরুষ ঘুঘুটির কথা শুনে উপস্থিত চার মহান অতিথি একদিকে যেমন খুশি হলো, তেমনই চিন্তিত হলো। তাদের মধ্যে কে যে সবচেয়ে প্রবীণ তা তারা নিজেরাই জানে না। সুতরাং কে বসবে প্রবীণতম অতিথির জন্য নির্ধারিত প্রথম আসনে? তারা সবাই একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। তাদের দেরি দেখে পুরুষ ঘুঘুটি আবার হাত জোড় করে অনুরোধ জানায়, 'সম্মাননীয়রা, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। দয়া করে আপনারা আসন গ্রহণ করুন এবং খাবার শুরু করুন।'

চার অতিথিও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছে। তারাও খাওয়া শুরু করার জন্য উসখুস করছে। কিন্তু কে সবচেয়ে বেশি প্রবীণ তা নিশ্চিত হতে না পারায় কেহই প্রথম আসনে বসার সাহস দেখাতে পারছে না।

তাদের মধ্যে দাঁড়কাকের ক্ষুধা লেগেছে সবচেয়ে বেশি। দুদিন ধরে কিছু খায়নি সে। খাবারের গন্ধে তার ক্ষুধা আরও বেড়ে যায়। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তার পেট চোঁ চোঁ করছে। তাই সে আর সাতপাঁচ না ভেবে সবার আগে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠের জন্য নির্ধারিত প্রথম আসনে গিয়ে বসে যায়। দাঁড়কাকের এই আচরণে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয় সারস। সে লাফ দিয়ে এসে দাঁড়কাকের উপর পড়ে এবং তার কালো চুলগুলো ছিঁড়ে ফেলে। দাঁড়কাকও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সেও সারসকে তার লম্বা গলায় কামড়ে দেয়, তার শক্ত পাখনা দিয়ে আঘাত করে সারসের গায়ে। দু'জনে যখন মারামারিতে ব্যস্ত তখন চিল চুপচাপ এসে বসে যায় সেই প্রথম আসনে। এতোক্ষণ একা একা ঝিমুচ্ছিলো প্যাঁচা। কিন্তু সুযোগসন্ধানী চিলের এই ঔদ্ধত্য দেখে খেপে যায় সে। দ্রুত ছুটে এসে কামড়ে আঁচড়ে আহত করে চিলকে। চিলও রুখে দাঁড়ায়। লেগে যায় চিল ও প্যাঁচার যুদ্ধ। এই সব দেখে

ঘুঘুতো অবাক। সবার মাঝখানে ছুটে এসে চিৎকার দিয়ে ওঠে– 'কী করছেন আপনারা? ঝগড়া থামান। আপনারা সবাই প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ লোক, সম্মাননীয়। আপনারা যদি এরকম করেন তাহলে সেটা হবে খুবই লজ্জার।' কিন্তু কে কার কথা শোনে। তারা তাদের ঝগড়া-মারামারি চালিয়ে যায়। আর এর ফলে সমস্ত খাবার সামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়।

ঝগড়া থামাতে না পেরে ঘুঘু উড়ে গিয়ে বনের সব পাখিদেরে ঘটনাটি জানায় এবং দ্রুত এসে ঝগড়া থামাতে অনুরোধ করে। খবর শুনে সব পাখি ঘুঘুর বাড়িতে উড়ে আসে এবং সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে শোনে। পাখিদের রাজা শকুন তখন দাঁড়কাককে ডেকে বলে, 'আচ্ছা দাঁড়কাক, সকলের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ কে তা নিশ্চিত না হয়েই তুমি যে প্রথম আসনে বসে গেলে, তার কারণ কি? আসলে তোমার বয়স কত?'

শকুনের কথা শুনে দাঁড়কাক তার স্বভাবসুলভ কর্কশ কণ্ঠে জবাব দেয়, 'শোনো মান্যবর, আমরা দাঁড়কাকেরা খুব প্রাচীন পাখি। আমার বয়স যে কত তা আমি নিজেও জানি না। তবে এটুকু জানি, এই মৈতৈভূমিতে ('মৈতৈ' মানে 'মণিপুরি') প্রথম যখন নদীর তলদেশ খনন করা হয়েছিল তখন আমরাই সেখানে ছিলাম। আমিই তখন চাতক পাখিকে খননকার্যের সুবিধার্থে নদীর পানি পান করে শুকিয়ে ফেলার কাজে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছিলাম।'

শকুন তখন সারসের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা লম্বা ঠ্যাংওয়ালা সারস, তুমিইবা দাঁড়কাককে প্রথম আসনে বসতে বাধা দিতে গেলে কেন? তোমার বয়সইবা কত?'

'মান্যবর', সারস ক্যাচক্যাচ করে ওঠে, 'আমার তুলনায় দাঁড়কাকতো সেদিনের দুগ্ধপোষ্য শিশু। সারসেরা সেই মণিপুরিদের প্রথম রাজা নোংদা লাইরেন পাখংবা-র আমল থেকে এখানে বাস করছে। আর এই নোংদা লাইরেন পাখংবা হলেন দাঁড়কাকের ভাষ্যমতে যিনি নদীর তলদেশ খনন করেছিলেন সেই লাইনিংথৌর (দেবতা বা রাজা) প্রপিতামহ।'

সারসের কথা শুনে সবাই বিশ্বাস করলো দাঁড়কাকের চেয়ে সারসের বয়স বেশি। এবার শকুন ঘুরে দাঁড়ালো চিলের দিকে। 'আচ্ছা চিল মহাশয়, এখন তুমিই বলো তোমার বয়স কতো। কেন তুমি অন্যদের প্রথম আসনে বসতে দিতে আপত্তি করছো?'

শকুনের এ-কথা শুনে চিল চিঁচিঁ করে বলে উঠলো, 'দেখুন মান্যবর, তাদের কথা শুনে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, এই দাঁড়কাক বা সারস তারা কেউই বয়সের বিচারে আমার ধারেকাছেও নেই। আমরাই সেই প্রথম পাখি যাদেরকে সানামহী ও পাখংবা (সানামহী ও পাখংবা হলেন মণিপুরি পুরাণকাহিনি অনুযায়ী পরমপুরুষ অতিয়া

গুরু শিদাবার দুই পুত্র) পৃথিবী সৃষ্টির পরপর সৃষ্টি করেছিল। নোংদা লাইরেন পাখংবা অথবা নদীর তলদেশ খননের কাহিনিতো এই সেদিনের মাত্র।'

চিলের কথায় সমস্ত পক্ষিসমাজ নিশ্চিত হলো বয়সের বিচারে চিলই সবচেয়ে প্রবীণ। শকুনেরও মনে হলো চিলের এই যুক্তির কাছে বাকিদের যুক্তি একেবারে অর্থহীন। তবু সে একবার প্যাঁচার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা পেঁচক মহাশয়, তুমি কি এখনও ঘুমিয়ে আছো?'

প্যাঁচা একান্ত অনিচ্ছায় তার দিবানিদ্রা ভেঙে চোখ মেলে তাকালো, 'কী হয়েছে পুত্র?'

শকুন তার কথার সুর ধরেই বললো, 'আমরা এতোক্ষণ যা নিয়ে আলোচনা করছিলাম তুমি বুঝি তা শুনোনি। আচ্ছা, তোমার বয়স কতো?'

'কী বললে? একটু জোরে বলো বাবাজি, আমি কানে একটু কম শুনি।'

শকুন তার কথার পুনরাবৃত্তি করে বললো, 'ঘুঘু তোমাদের চারজনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এখানে। খেতে বসার আগে কার বয়স কতো, অর্থাৎ, কে বয়োজ্যেষ্ঠ এ নিয়ে একটা বিরোধ লেগে যায়। আমরা এসব বিষয় নিয়েই কথা বলছিলাম।'

'হুম, সেতো বুঝলাম। তা কী হয়েছে, কী জানতে চাও তুমি?' কুঁ কুঁ করে উঠলো প্যাঁচা।

'আমরা বাকি তিনজনের কথা শুনেছি। তাদের বয়স কতো এ-নিয়ে একটা ধারণাও পেয়েছি। এখন জানতে চাচ্ছি, তোমার বয়স কতো। তাতে করে তোমাদের মধ্যে কে বয়োজ্যেষ্ঠ তা নির্ধারণ করা যাবে।'

শকুনের কথা শুনে রেগে উঠলো প্যাঁচা। 'কী যা-তা বলছ তুমি। তুমি কি ভদ্রতাবোধটাও হারিয়ে ফেলেছো? তুমি না আমাকে 'ইপু' (দাদু) বলে ডাকতে। তুমি আমাকে এই পুঁচকে ছোঁড়াদের সঙ্গে তুলনা করছো?'

'ঠিক আছে ইপু', শকুন নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বলে, 'কিন্তু তোমার প্রকৃত বয়সটা কতো? চিল বলছে, পৃথিবী সৃষ্টির সময় সানামহী ও পাখংবা প্রথম পাখি হিসেবে তাদেরকে সৃষ্টি করেছিল। সেই হিসাবে পাখিদের মধ্যে চিলেরাই সবচেয়ে প্রবীণ।'

'ফু', প্যাঁচা অবজ্ঞার সুরে বললো, 'আমার বয়স যে কতো তা আমি কেন, পাখিসমাজের কেউ-ই জানে না। তবে এটুকু বলতে পারি, চিল-তো আমার প্রপৌত্রের ঘরের প্রপৌত্রেরও সমান নয়।'

সমস্ত পক্ষিকুল অবাক-বিস্ময়ে গা ঝাপটা দিয়ে উঠলো, তারপর তারা একে অপরের দিকে তাকালো। শকুনও স্তম্ভিত হয়ে প্যাঁচার গোল গোল বড় চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

মাথা ঘুরিয়ে বড় বড় চোখ করে সকলের দিকে একবার তাকিয়ে প্যাঁচা আবার

CamScanner

বলতে শুরু করে, 'আচ্ছা তাহলে তোমরা সবাই শোনো, আমি আজ আমার বয়সের হিসাব দেবো। তোমরা সবাই জানো 'অতিয়া গুরু শিদাবা' হলেন দেবতাদের দেবতা, তিনি সানামহী ও পাখংবার পিতা এবং সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা। আর সেই অতিয়া গুরু শিদাবা হলেন আমার জামাতা মানে জামাই। তিনি আমাকে 'ইকু' বলে ডাকেন। অন্য দেবতারা তাই আমাকে বলেন 'মকু' (মণিপুরি ভাষায় নিজের শ্বশুরকে 'ইকু' বলে সম্বোধন করা হয়, আর অন্যের শ্বশুরকে বলা হয় 'মকু'। প্যাঁচার মণিপুরি নামও 'মকু')। এখন তো শুধু দেবতারা নয়, সবাই আমাকে 'মকু' বলে ডাকে। এখন তোমরাই বলো, কে বেশি প্রবীণ—আমি না ওই চিল? আমার কথা যদি তোমাদের বিশ্বাস না-হয় তোমরা আমার জামাই অতিয়া গুরু শিদাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারো।'

প্যাঁচার কাহিনি এতোটাই বিশ্বাসযোগ্য ছিল যে, সমস্ত পক্ষিকুল বলে ওঠে 'ঠিক ঠিক'। তারা নিজেরা ফিসফিস করে আলোচনা করে, 'প্যাঁচার কথাই ঠিক। সে-ই সমস্ত পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ, বয়স্ক। দেখো দেখো, তার দিকে তাকালেই তো বিষয়টি বোঝা যায়।'

একটু সময় চিন্তা করে শকুন প্যাঁচার সামনে অবনত হয়ে প্রণাম করে, তারপর বলে, 'আমাকে ক্ষমা করুন হে প্রবৃদ্ধ পাখি। আমরা এখন নিশ্চিত যে আপনিই আমাদের মধ্যে প্রবীণতম। আজ আমি নিজেই আপনার সেবা করবো ইপু। আমাকে সে সুযোগ দিয়ে কৃতার্থ করুন। আপনি আসুন আমার এই বিশাল দুই পাখার মাঝখানে আমার পিঠে বসুন। আমি আপনাকে বহন করে নিয়ে যাবো।'

প্যাঁচাকে পিঠে নিয়ে শকুন পাখা মেললো আকাশে। আর সমস্ত পাখি তাকে অনুসরণ করে উড়ে গেলো। কেবল ঘুঘু দম্পতি কী করবে বুঝতে না-পেরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো নিজেদের বাসার সামনে।

CamScanner

আঁকা : সরকার সজীব

য়েন্নখা পাউদাবি

(দেয়ালে কান পেতে শোনা পেতনি)

একদা এক গ্রামে বাস করতো এক দম্পতি—তোম্বা ও লৈহাউ। তাদের কোনো সন্তানাদি নেই। তবে এ নিয়ে তাদের মধ্যে তেমন কোনো দুঃখবোধও ছিল না। তারা একে অপরকে খুব ভালোবাসতো এবং সুখে-শান্তিতেই কেটে যেতো তাদের জীবন। দিনের বেলা তারা সারাদিনই কঠোর পরিশ্রম করত, কিন্তু রাতে খাওয়াদাওয়া করে তারা দুজনে বসে নানা গল্পগুজব করে সময় কাটাত। তাদের এই একে-অপরের প্রতি গভীর ভালোবাসা আর সুখি-সুন্দর জীবন গ্রামবাসীদের জন্যও ছিল আনন্দের এবং প্রেরণার। মানুষের দেয়ালে কান পেতে শোনা এক পেতনি প্রায়শই রাতের বেলা লুকিয়ে তোম্বা-লৈহাউয়ের কথা শুনতো। পরস্পরের প্রতি তাদের ভালোবাসা দেখে তার ঈর্ষা হতো। সে একটু একটু করে তোম্বা'র প্রেমে পড়ে গেলো এবং মনে মনে চাইতো একদিন সে তোম্বাকে স্বামী হিসেবে পাবে।

একদিন রাতে খাওয়াদাওয়ার পর তোম্বা ও লৈহাউ 'ফুঙ্গা'র (মণিপুরি গৃহে নির্ধারিত একটি জায়গায় একটি অগ্নিকুণ্ড থাকে যা সারাক্ষণই প্রজ্জ্বলিত তাকে; এটিকে ফুঙ্গা বলে) দুই পাশে বসে গল্পগুজব করছে। তোম্বা হঠাৎ বলে উঠলো, 'আজ

আমরা ধাঁধা চালাচালি করবো। ধাঁধার উত্তর যে দিতে পারবে না সে বোয়াল মাছ কিনে খাওয়াবে। ঠিক আছে?'

লৈহাউ রাজি হলো। বলল, 'ঠিক আছে, তা-ই হবে। তাহলে তুমিই বলো আগে।'

তোম্বা একটি ধাঁধা বলল :

'একটি লোক তার চারটি হাত
কাপড়চোপড় জড়ানো তার গায়,
ওই লোক নাচে ধীরে ধীরে
আরেকজন তখন মাটিতে গড়াগড়ি খায়।'

'এবার বলো দেখি এর উত্তর কী হবে। উত্তর দিতে না-পারলে কিন্তু তোমাকে কাল বোয়াল মাছ কিনে খাওয়াতে হবে।'

তার স্ত্রী লৈহাউ ধাঁধাটি নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবে। কিন্তু উত্তর খুঁজে পায় না। তাই সে বলে, 'আমি পারবো না। তুমিই এর উত্তর বলে দাও।'

'ঠিক আছে', তোম্বা হাসতে হাসতে বলে 'এর উত্তর হবে 'তাওত' (বাঁশ দিয়ে তৈরি চার বাহুবিশিষ্ট বড় নাটাইয়ের মতো তাঁতিদের ব্যবহৃত সুতা প্যাঁচানোর যন্ত্রবিশেষ)। আসলে উত্তরটা খুবই সহজ ছিল। তোমরা এ যন্ত্রটি কাপড় বুননের সময় ব্যবহার করো। এই 'তাওত' হলো চার হাত বিশিষ্ট লোক, আর 'তাওত' ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুতা প্যাঁচানোকেই বলা হচ্ছে ওই লোকের নাচ। আর সুতা টানার ফলে মাটিতে পড়ে থাকা সুতার মুঠোও গড়াগড়ি খায়।'

লৈহাউ বলে, 'হ্যাঁ তাই তো, এটাতো আমার মাথায় আসেনি। ঠিক আছে, এবার আমার পালা। আমার ধাঁধার উত্তর যদি তুমি দিতে না পারো, তাহলে শাস্তি কাটাকাটি হয়ে গেলো।'

তোম্বা অধৈর্য হয়ে হয়ে বলে, 'ঠিক আছে বাবা, মানলাম তোমার শর্ত। এখন তোমার ধাঁধাটাতো বলো।'

'যতোক্ষণ মুখে দেবে খাবার
ততোক্ষণ বাজে ধ্বনি কান্নার,
আর যখনই খাবার দেওয়া বন্ধ হবে
কান্নাও তখনই থেমে যাবে।'

'বলতে হবে এটা কী'—হাসতে হাসতে ধাঁধাটা ছুঁড়ে দেয় লৈহাউ।

তোম্বা একটু সময় চিন্তা করে বলে, 'ও এটা? এটা তো খুবই সহজ। এর উত্তর হলো 'কপত্রেং'-এ (মণিপুরিদের ব্যবহৃত সুতা কাটার একধরনের যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রে সুতা কাটার সময় কান্নার মতো একরকম করুণ সুর সৃষ্টি হয়) সুতা কাটা।'

লৈহাউ বলে, 'হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। তাহলে তো কাল সকালে আমাকেই বোয়াল

CamScanner

মাছ কিনে তোমাকে খাওয়াতে হবে। ঠিক আছে, তাই হবে।'

এক য়েন্নখা পাউদাবি (দেয়ালে কান পেতে শোনা এক জাতীয় পেতনি বিশেষ) লুকিয়ে তাদের সমস্ত কথা শুনছিল। দুষ্টু পেতনি ভাবল, এই তো সুযোগ। কাল সকালে যখন ওই মেয়েলোকটি বাজারে মাছ আনতে যাবে তখনই তার রূপ ধরে ঘরে ঢুকে যাবো, তোম্বার স্ত্রী সেজে থাকবো। লৈহাউ বাজার থেকে ফিরে এলে তোম্বাকে নানাভাবে বুঝিয়ে লৈহাউকে দুষ্টু আত্মা বলে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। তারপর সুযোগ বুঝে একদিন তার ঘাড় মটকে রক্ত খাবো। আর আমি তোম্বার স্ত্রী হয়ে সারা জীবন সুখে সংসার করবো। এই পরিকল্পনা করে য়েন্নখা পাউদাবি রাতের মতো ফিরে গেল নিজের আস্তানায়।

পরদিন সকালে প্রাতকালীন সমস্ত কাজ সেরে লৈহাউ বাজার থেকে বোয়াল মাছ কিনে আনার জন্য রওনা দিল। তাকে বেরিয়ে যেতে দেখেই লুকিয়ে থাকা য়েন্নখা পাউদাবি বউটির রূপ ধরে একটি বোয়াল মাছ হাতে ঘরে ঢুকলো। তোম্বাতো অবাক। তার স্ত্রী লৈহাউতো এইমাত্র গেল বাজারে মাছ আনতে, এতো তাড়াতাড়ি ফিলে এলো কী করে। তোম্বার বিস্মিত দৃষ্টি দেখেই য়েন্নখা পাউদাবি বুঝে নিল তার মনের কথা। তাই সে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলল, 'আর বলো না, আমার কপালটা খুব ভালো। বাজারে যাবো বলে বেরিয়েছি, দেখি রাস্তায় এক লোক বোয়াল মাছটি নিয়ে বাজারে যাচ্ছে বিক্রি করবে বলে। সুযোগ পেয়ে আমিও তার কাছ থেকে মাছটা কিনেই নিলাম।'

তোম্বার মনে আর কোনো সন্দেহ থাকলো না। সরল মনে সমস্ত কিছুই মেনে নিলো। খুশি হয়ে বললো, 'ঠিক আছে, মাছটা আমাকে দাও, আমি কেটেকুটে বানিয়ে দিচ্ছি। তুমি বরং রান্না চড়িয়ে দাও।' তোম্বা বোয়াল মাছটা ধুয়ে কেটেকুটে বউয়ের হাতে দিয়ে বলল, 'খুব সুন্দর করে রাঁধবে। আমি গরুটাকে মাঠে দিয়ে আসছি। এসেই গোসল করে খেতে বসবো।' এই বলে সে ঘরের বাইরে বেরুতেই দেখে তার স্ত্রী লৈহাউ হাতে একটি বোয়াল মাছ ঝুলিয়ে বাজার থেকে ফিরছে। তোম্বাতো অবাক। ঘরের ভেতর তার স্ত্রী রান্না করছে, আবার বাইরে দেখি আরেকজন ঠিক তার স্ত্রীর মতোই দেখতে মাছ নিয়ে বাজার থেকে ফিরছে। কিছু বুঝতে না পেরে তোম্বা স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাকে না একটু আগে মাছ নিয়ে আসতে দেখলাম। আমি কেটেকুটে দিলাম সে মাছ আর তুমি রান্না শুরু করে দিলে। এখন আবার মাছ নিয়ে কোত্থেকে উদয় হলে?' স্বামীর কথায় লৈহাউও অবাক হয়ে গেলো। 'কী বলছো তুমি? আমি মাছ নিয়ে আগে ফিরলাম কোথায়? আমি তো এইমাত্র বাজার থেকে মাছ নিয়ে এলাম। কে আবার এলো আমাদের ঘরে? নিশ্চয়ই কোনো মায়াবিনী হবে।' এই বলে লৈহাউ একছুটে ঘরের ভেতর গিয়ে দেখে ঠিক তারই মতো দেখতে একজন একমনে রান্না করছে।

CamScanner

লৈহাউ আর নিজেকে সামলাতে পারল না, চিৎকার করে উঠলো—'বেহায়া মেয়েলোক কোথাকার! কে তুমি? অন্যের ঘরে বউ-সেজে রান্না করতে লজ্জা করছে না তোমার? কোত্থেকে এসেছো তুমি?' লৈহাউ সেজে থাকা পেতনিটাও রাগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে পালটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো—'এ-কী অবাক কাণ্ড! আমার বাড়িতে এসে আমাকেই জিজ্ঞেস করছ, আমি কে? তোমার তো সাহস কম না! আমার বাড়িতে এসে আমাকেই অপমান করছ, আমার স্বামীকে কেড়ে নিতে চাইছো। বেহায়াটা কে? তুমি না আমি?'

লৈহাউ-এর পিছু পিছু ঘরে ঢুকে এবং দুজনের কথাবার্তা শুনে তোম্বাও অবাক। সে বুঝতে পারছে না কী করবে। কোনজন যে তার স্ত্রী কেমন করে বুঝবে সে? এর মাঝে তোম্বার আসল স্ত্রী ঝাঁপিয়ে পড়েছে লৈহাউ রূপী পেতনিটার ওপর। তার চুল ধরে হেঁচকা টান দিয়ে চিৎকার করে বলছে—'তোমাকে আজ শেষ করে দেবো আমি। নষ্ট মেয়ে কোথাকার!' পেতনিটাও কম যায় না। সে-ও গজরাতে গজরাতে লৈহাউ-এর চুল ধরে টান দিলো। একজন আরেকজনকে লাথি মারছে। চুলাচুলি লাথালাথিতে লন্ডভন্ড হয়ে গেলো ঘরের জিনিসপত্র। কী করবে বুঝে উঠতে না-পেরে তোম্বা কেবল জোরে জোরে চিৎকার দিতে লাগলো। তার চিৎকার আর চেঁচামেচি শুনে পাড়া প্রতিবেশি ছুটে এলো। একই চেহারার দুই স্ত্রীলোকের এই ঝগড়াঝাঁটি দেখে তারাও অবাক। সবাই মিলে দুজনের ঝগড়া থামালো। তারপর ঠান্ডা মাথায় সবার কথা শুনলো। কিন্তু কোনো সমাধানে যেতে পারলো না। সব কথা শুনে এক বুড়ো এগিয়ে এসে বলল, 'দেখো, এ ধরনের সমস্যার কথা আমরা কখনও শুনিনি। এর বিচার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র ঈশ্বরই এর ন্যায় বিচার করতে পারবে। রাজাকে বলা হয় ঈশ্বরের প্রতিনিধি। অতএব চলো, আমরা সবাই গিয়ে রাজার কাছে এর ন্যায় বিচার প্রার্থনা করি।'

উপস্থিত সবাই বুড়োর এই কথা যথার্থ বলে মেনে নিলো। তারা সবাই মিলে গেলো রাজদরবারে। রাজাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। সব শুনে রাজা বললেন, 'এই ধরনের ঘটনা আমার রাজ্যে আগে আর কখনও ঘটেনি। বিষয়টা খুব জটিল। আমার পক্ষেও এর ন্যায় বিচার করা সম্ভব না। একমাত্র ঈশ্বরের পক্ষেই প্রকৃত বিচার করা সম্ভব। আমিও তাই ঈশ্বরের সাহায্য নেবো। তবে এর আগে বলি, যদি সম্ভব হয়, নিজেরা মিটমাট করে ফেলো।' কিন্তু দুজনের কেউই মিটমাট করতে রাজি নয়। তারা দুজনেই ন্যায় বিচার চায়। তখন রাজা তার পরিচারকদের দিয়ে একজন 'মাইবা'কে (তন্ত্র-মন্ত্র জানা বিভিন্ন পূজা-পার্বণের কাজ করা তান্ত্রিক) ডেকে আনলেন এবং দুই মুখ খোলা একটি বাঁশের চোঙা নিয়ে এলেন। রাজার আদেশে মাইবা বাঁশের চোঙাটিকে মন্ত্রপূত করলেন। তারপর চোঙাটিকে একটি বিশাল কলাপাতার ওপর সবার সামনে সাজিয়ে রাখলেন। রাজার ইঙ্গিতে চোঙার

দুদিকে দুজন শক্ত সমর্থ প্রহরী দাঁড়িয়ে গেলো। তারপর রাজা মহাশয় তোম্বার স্ত্রী পরিচয়দানকারী একই চেহারার দুই মহিলার উদ্দেশে বললেন, 'দেখো, সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। মাইবা এই বাঁশের চোঙাটিকে পবিত্র ঈশ্বর 'লাইনিংথৌ'-এর কাছে উৎসর্গ করে মন্ত্রপূত করে রেখেছেন। এখন তোমাদের দুজনকে এই বাঁশের চোঙার ভেতর দিয়ে একদিকে ঢুকে অন্যদিকে বেরুতে হবে। ঈশ্বরের কৃপায় শুধু যে তোম্বার প্রকৃত স্ত্রী সে'ই কেবল চোঙার ভেতর দিয়ে বেরুতে পারবে। এইবার শুরু হোক পরীক্ষা। তোমরা প্রস্তুত তো?' লৈহাউ-এর রূপধারী পেতনি য়েন্নখা পাউদাবি খুব খুশি। তার পক্ষে তো এটা কোনো ব্যাপারই নয়। সে তাই আনন্দে লাফাতে লাফাতে বলে, 'আমি প্রস্তুত'। কিন্তু সত্যিকারের যে লৈহাউ তার মন খারাপ হয়ে যায়, সে কোনও কথা না-বলে চুপচাপ থাকে।

রাজা তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে কে আগে এই পরীক্ষা দেবে?'

মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না-করে জবাব দিল লৈহাউরূপী পেতনি—'আমি, আমি আগে এই বাঁশের চোঙার ভেতর দিয়ে বেরুবো। আমি প্রমাণ করবো যে, আমিই সত্যিকারের লৈহাউ।'

'ঠিক আছে' রাজা বললেন, 'তবে তা-ই হোক'। সঙ্গে সঙ্গে পেতনিটি তার নিজের ক্ষমতাবলে নিজেকে এতো ছোট করে ফেললো যে সে অনায়াসেই বাঁশের ফাঁপা নলের ভেতর ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজার ইঙ্গিতে চোঙার দুই দিকে দাঁড়ানো দুই প্রহরী চোঙার দুই মুখ শক্ত করে বন্ধ করে দিল। চোঙার ভেতরে আটকে পড়লো পেতনিটা। অনেক চেষ্টা করেও আর বেরোতে পারল না সে। রাজা বাঁশের চোঙাটাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিলেন।

রাজার আদেশ শুনে বন্দি হওয়া পেতনি য়েন্নখা পাউদাবি হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। 'মহারাজ, আমার ভুল হয়েছে, আমি অনেক অন্যায় করেছি, আমাকে এবারের মতো ক্ষমা করে দিন। আমি আসলে লোকটির প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। তাই সুযোগ বুঝে তার স্ত্রীর রূপ ধারণ করেছিলাম। এই ভুল আর আমি জীবনে কখনও করবো না। আমাকে ক্ষমা করে দিন মহারাজ। আমাকে প্রাণে রক্ষা করুন।' অপরাধী হলেও পেতনিটির এই সরল স্বীকারোক্তিতে রাজার মনে দয়া হলো। তিনি য়েন্নখা পাউদাবিকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে বলে দিলেন এই এলাকা ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে। জীবনে যেন তাকে আর এখানে দেখা না যায়।

রাজার কাছে ন্যায় বিচার পেয়ে গ্রামবাসী সবাই খুশি হলো। তোম্বাও তার স্ত্রীকে ফিরে পেয়ে খুশি। তারা সবাই গ্রামে ফিরে গেল এবং তোম্বা ও লৈহাউ সুখে-শান্তিতে সংসার করতে থাকলো।

CamScanner

এ কে শেরামের জন্ম ১৯৫৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি (জন্মকোষ্ঠী অনুযায়ী) হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলাধীন ১নম্বর গাজিপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত গোবরখোলা গ্রামে। বাবা—নবকিশোর সিংহ ও মা—থাম্বাল দেবী। তিনি বর্তমানে ৩৫/বি কলকাকলী, লালাদিঘির পূর্বপার, সিলেট-৩১০০-এর স্থায়ী বাসিন্দা। বাণিজ্য ও আইনে স্নাতক ডিগ্রিধারী এ কে শেরাম সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে তিনি যেসব সংগঠনের সঙ্গে সভাপতি হিসেবে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন, সেগুলো হলো—বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, সিলেট জেলা সংসদ; মণিপুরি ভাষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা, সিলেট; জাতীয় কবিতা পরিষদ, সিলেট; বাংলাদেশ প্রগতি লেখক সংঘ, সিলেট ও বাংলাদেশ মণিপুরি সাহিত্য সংসদ, সিলেট। এছাড়া তিনি যেসব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা এখনও আছেন সেগুলো হলো—ইন্টিগ্রেটেড মণিপুরি অ্যাসোসিয়েশন (ইমা) বাংলাদেশ; সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমী; সোনালী ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, সিলেট; কবি দিলওয়ার পরিষদ, সিলেট; প্রথম দিনের সূর্য, সিলেট; সনাক, সিলেট ইত্যাদি।

সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য প্রাপ্ত এওয়ার্ড ও সম্মাননা হলো—'সোনামণি মেমোরিয়েল এওয়ার্ড' (সিলেট-১৯৯৪); 'শেকড়ের সন্ধানে এওয়ার্ড' (সিলেট-১৯৯৯); 'য়েংখোম কমল মেমোরিয়েল এওয়ার্ড' (শিলচর, ভারত-২০০৩); 'সাহিত্যভূষণ' (আসাম মণিপুরি সাহিত্য পরিষদ-২০০৮); 'প্লাটিনাম জুবিলী বিশেষ সম্মান' (মণিপুরি সাহিত্য পরিষদ, ইম্ফাল, মণিপুর-২০১০); 'থিয়াম লৈরিকমচা ইন্টারন্যাশনাল এওয়ার্ড (ইম্ফাল, মণিপুর-২০১১); 'হিজম ইরাবত মেমোরিয়েল ইন্টারন্যাশনাল এওয়ার্ড (ইম্ফাল, মণিপুর-২০১১); ধানসিঁড়ি সম্মাননা-২০১২ (ঢাকা-২০১২)।

CamScanner

নাগরী

ISBN 978-984-91241-1-2

9 789849 124112

NAGREE, Barutkhana
Sylhet-3100, Bangladesh
01714610061, 01712 082967
Nagree14@gmail.com
Price: ৳ 130, $5, £ 5

CS CamScanner